KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৮১ নং বাহির মৃজাপুর
Collection : KLMLGK	Publisher : শরৎচন্দ্র ঘোষ
Title : বিধর	Size : 5.5" x 9" 13.97 x 22.86 c.m.
Vol. & Number : ১/১ ১/৫ ১/৬	Year of Publication : আশ্বিন, ১২৭৪ মাঘ, ১২৭৪ ফাল্গুন, ১২৭৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রমথনাথ মিত্র	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

১০।	Table of Ascendants & Ephemeris—By N. C. Lahiri	৩৫.০০
১১।	লঘুজাতকম্– অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য	৫০.০০
১২।	বৃহৎজাতকম্—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী	৪২.০০
১৩।	জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ—১ম ও ২য়, প্রতি খণ্ড	৬৫.০০
	ঐ ৩য় খণ্ড	৩৫.০০
১৪।	গ্রহের দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল ডাঃ রণতোষ সাহা	৬৫.০০
১৫।	ফলদীপিকা—ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী	৩৫.০০
১৬।	ভারতীয় সাহিত্যে জ্যোতিষ প্রসঙ্গ—ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়	৩২.০০
১৭।	জ্যোতিষতত্ত্ব সংকেত ও বিশ্লেষণ—শ্রীমলয় রায়	২০.০০
১৮।	মিথ্যা নয়, সত্য—প্রীতি রায়	৫০.০০
১৯।	গ্রহের ভাবপতির দ্বাদশ ভাবস্থিতি ফল—ডাঃ রণতোষ সাহা	

ভি.পি তে পুস্তক পাঠানো হয়ে থাকে। ডাক ব্যয় বাবদ ১০.০০ ও পুস্তকের অর্ধ মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হবে।

৬৫.০০ টাকা

১ম ভাগ। আশ্বিন ১২৯৪ ১ম সংখ্যা।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বিভা।

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক
৬১ নং বাহির শ্যামবাজার হইতে প্রকাশিত।

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
...দ্যা (... [illegible]	শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১
বিভা	শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু	২
জাতিভেদ	পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ	১০
সিপাহি যুদ্ধে ব্রিটিশনীতি	শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত	১৮
কৃষ্ণনগর	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ	২৪
জৈনধর্ম্ম	শ্রীহরিমোহন বিদ্যাভূষণ	৩৩
সনাতন ধর্ম্ম	শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার	৩৭
শৃঙ্খলা	শ্রীআশুতোষ মিত্র, এম, এ	৩৯
শৈলজা	জনদাস	৪২

বিভা সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

১। বিভার বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ২৷৹ টাকা ও মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহিত ২৸০ টাকা বার আনা। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵০ ছয় আনা ও ডাকমাশুল ৴১০ আধ আনা।

২। বিভার মফস্বলের গ্রাহকগণকে মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না বিভাতেই মূল্য-প্রাপ্তিস্বীকার করা যাইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা, ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য উপায়ে বিভার মূল্য লওয়া যাইবে না। ডাকের টিকিট পাঠাইলে প্রতি টাকার ৴০ এক আনা হিসাবে কমিসন দিতে হইবে। মনিঅর্ডার পাঠাইলে নামের নম্বর কুপানে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকদিগকে বিভার অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে হইবে।

৫। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিলে তাঁহার নূতন ঠিকানা তিনি পত্র দ্বারায় আমাকে যত দিন না জানাইবেন ততদিন পূর্ব্ব ঠিকানাতেই তাঁহার পত্রিকা পাঠান যাইবে ইহাতে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ হইলে তজ্জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৬। বিভার সমস্ত পত্র, প্রবন্ধ, পুস্তক ও মূল্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠান আবশ্যক। ব্যারিং বা ইনসফিসেন্ট পত্র গৃহীত হইবে না। কেহ কোন প্রব[...] বিভার আফিস হইতে ফেরত লইতে অথবা পত্রের প্রত্যুত্তর পাওয়ার ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে ডাকমাশুল পাঠাইতে হইবে।

৭। বিভা প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশিত হইবে। [...]োন গ্রাহক পত্রিকা না পাইলে তাহার পর মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে আমাকে [...]র্লে তজ্জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৮। মফঃস্বলের গ্রাহক মহাশয়গণ পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ কা[...] তাঁহাদিগের আপন আপন নামের নম্বর উল্লেখ করিবেন নতুবা তাঁহাদিগের চিঠির উত্তর দেওয়া বড় সহজ হইবে না। টাকা পাঠাইবার সময় ও ঐরূপ নম্বর উল্লেখ করা আবশ্যক। পত্রিকার মোড়কের উপর আপন আপন নামের নম্বর দেখিতে পাইবেন।

বিভায় বিজ্ঞাপন দিলে প্রত্যেক লাইনে ।০ চারি আনা দিতে হইবে। অধিক দিনের জন্য হইলে সতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র।
বিভার কার্য্যাধ্যক্ষ

৬১ নং বাহির শ্যামবাজার
কলিকাতা।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বিভা।

[১ম সংখ্যা সন ১২৯৪ সাল ১ম খণ্ড]

বিভা।

আমি মানস জগতে রই
জড় জগতের জড়তা পরশি
ব্যাথায় কাতর হই।

যে চাহ হেরিতে জগত আমার
খুল ত্বরা করি নয়ন তাহার
দেখাইব সেই অপূর্ব্ব আকার
জগত মাধুরীময়।

সাহিত্য বিজ্ঞান সঙ্গীত দর্শন
কেবলি মাধুরী করিয়া চয়ন
বিপুল মহিমা করিতে সৃজন
যেথানে নিয়ত রত।

সেই খানে আমি কিরণ ছড়াই
সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্যে ভ্রমিয়া বেড়াই
পরম আনন্দ বুকেতে জড়াই
নিদ্রায় স্বপন মত।

সে শোভা হেরিতে চাহ কোন জন
নয়ন তাহার কর উন্মোচন।
আলো করি পথ করিব গমন
তোমরা আইস পাছে।

মানবের মন সর্ব্বসৃষ্টি সার
তুচ্ছ এ প্রকৃতি তুলনায় তার
খুলিয়ে সে মহা মানসের দ্বার
লইয়ে যাইব কাছে।

হেরিবে বিস্ময়ে সম্মুখে তোমার
অকূল আকৃতি জ্ঞান পারাবার
শান্ত স্নিগ্ধ নীর অতল অপার
বেলায় রতন রাশি।

নিকটে তাহার করিলে গমন
জুড়াইবে দেহ জুড়াইবে মন
করিলে তাহার নীর পরশন
রতন উঠিবে ভাসি।

বসি তীরে তার দেখ চারিধার
ব্রহ্মাণ্ড হেরিবে সম্মুখে তোমার
অচিন্ত্য অনন্ত অজ্ঞেয় আঁধার
কিছুই তথায় নাই।

ধর্ম্ম কর্ম্ম নামে দুইখানি তরি
পারাবার তট আছে শোভা করি
ষোড়শী ললনা রূপ আমি ধরি
পথিকে দেখাই তাই।

স্থানে স্থানে তার স্বপ্ন রাজ্য মত
আছে শোভা করি দ্বীপ পুঞ্জ কত
পশ্চিমের সান্ধ্য মেঘ রাশি মত
গলিত হেমাঙ্গ মাখি।

নিকটে তাহার করিলে গমন
পুলকে সিহরি উঠে দেহমন
ভরে যায় দুই নয়ন শ্রবণ
বিস্ময়ে ডুবিয়া থাকি।

একটি সে দ্বীপ প্রমোদ উদ্যান
বিরাজে বসন্ত তথা মূর্ত্তিমান
ফুটিয়া পড়েছে যথা তথা প্রাণ
প্রাণেতে সকলি ভরা।

উতলা পাখীর মধুর কূজন
নির্ঝরের মৃদু মধুর পতন
সৌরভে সমীরে প্রেম আলাপন
ভরিয়া রেখেছে ধর

কূলে উঠি দেখ সে দ্বীপ উপরি
কৌমুদী পড়িছে চারিধারে ঝরি
জলে স্থলে যেন হাসির মাধুরী
নিয়ত ফুটিয়া র

অগ্রসরি হের কুঞ্জ মনোহর
ডালে ডালে তার কুসুমের স্তর
দলে দলে তার নিবিড় ভ্রমর
গুঞ্জন নিকুঞ্জম

কুঞ্জের ভিতরে ফুল রেণু প'রে
বসি বাণী, বীণা শোভে স্কন্ধ 'পরে
অঙ্গুলি তরঙ্গে সুধা ধারা ঝরে
ভরিয়া জগত প্রা

কে হেরিবে হেন জগত আমার
লহ মোরে তুলি মানসে তাহার
হৃদয় খুলিয়া আনন্দ আমার
করিব তাহারে দ

শ্রীঈঃ—

বিভা।

এ জগৎ বিভাময়। যতকাল জগৎ, ততকাল বিভা। হিন্দু-দার্শনিক মতে জগৎ যদি অনাদি হয়, বিভাও তবে অনাদি। অনাদি কাল হইতে বিভা জগতের লোচন-স্বরূপ হইয়া দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিতে অনন্ত নারায়ণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্ত হ বিভারূপে অনন্ত জগৎ আলোকিত ক আছেন। বিভা তাঁহার রূপ, বিভা তাঁ

ঐশ্বর্য্য, বিভা তাঁহার তেজ, বিভা তাঁহার মহিমা। আমরা বিভাকে নমস্কার করি।

পুঞ্জীকৃত বিভারাশি বিভাকর, অনন্ত বিভার অংশ মাত্র। সেই অংশুমালী যখন লোক-লোচনের অদৃশ্য হইতে থাকেন, তখন তিনি সন্ধ্যাদেবীকে সাজাইয়া যান। সন্ধ্যাদেবী তখন অনন্ত আকাশের অসীম-প্রসার বসন পাতিলে বিভাকর সে বসনাঞ্চলে সুবর্ণময় বিভারাশি ছড়াইয়া দেন। সন্ধ্যাদেবী সেই রাশিকে পুঞ্জীকৃত করিয়া অগ্রে একটী তারা গড়িয়া দেখেন, কেমন দেখায়। সে তারার উজ্জ্বলতায়, সৌন্দর্য্যে, ও স্নিগ্ধতায় মোহিত হইয়া দেবী মুগ্ধ হইয়া পড়েন। সেই তারাকে শিরোভূষণ করিয়া তখন অগণ্য তারা গড়িয়া আপনার অনন্ত বসন ভূষিত করেন। স্ত্রীসুলভ ক্রীড়া-কৌতুকিনী সন্ধ্যাদেবী সেই তারাবলিতে আকাশের অনন্ত প্রসারে কতই বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি গড়িতে থাকেন। কোন খানে সিংহ, কোন খানে মেষ, কোন খানে বৃষ, কোন খানে মিথুন, প্রভৃতি রচনা করিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য জগৎকে ধ্বান্ত রাশিতে পরিব্যাপ্ত করেন। মাঝে বিভার ছায়াপথ সজ্জিত থাকে। তখন তিনি বিভাবরী নামে সেই তারা-খচিত ও ছায়াপথ-সজ্জিত বসন পরিয়া শোভিত হন। নিত্য নিত্য এই নূতন-সাজে-সজ্জিতা বিভাবরীদেবী জগতের মনোহরণ করিতেছেন। সেই বিভাবরী রচিত তারার কি রূপ! যদি তুমি বিভার সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও, তবে সেই তারাবলিকে দেখ। ঘোর তমিস্রা রজনীতে এক একটীকে লক্ষ কর। তখন দেখিতে পাইবে বিভার কি স্বর্গীয় দ্যুতি, কি জ্যোতির্ম্ময় রূপ! সে রূপ-জ্যোতিতে তেজ আছে, অথচ মাধুরী আছে; সে রূপের বিভায় উজ্জ্বলতা আছে, অথচ স্নিগ্ধতা আছে। তারা যেন সেই রূপ-বিভা লইয়া তোমার সহিত সম্ভাষণ করিতে আসেন। যেন স্বর্গের কি সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য দেখাইতে আসেন। তোমার কল্পনা তাহাকে কবিত্বে পরিপূর্ণ করে। বিভা তখন স্বর্গের কাব্য রূপে প্রকাশিত হন।

বিভাবরী দেবী কি শুদ্ধ অনন্ত আকাশে তারা ছড়াইয়া পরিতৃপ্ত হন? কৌতুকিনী সেই বিভা লইয়া কত ক্রীড়া করিতে বসেন। সুরলোকের ঠিক সম্মুখেই তেমতি একটি সাগরের অনন্ত দর্পণ বিছাইয়া সেই অগণ্য তারাবলিকে প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখান। স্বর্গে অনন্ত নীলাম্বরে অগণ্য তারা, মর্ত্ত্যে অসীম নীলাম্বু রাশিতে অগণ্য তারা। এই অনন্ত তারকা-খচিত সিংহাসন মধ্যে দেবী কি গভীর অন্ধকারে বসিয়া আছেন! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকার রূপসাগরের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া একবার দেখ রজনীর কি অন্ধ-রূপ, আর বিভার কি সৌন্দর্য্য! আকাশ পাতালে বিভার সমান সৌন্দর্য্য ও সমান রূপ। আকাশে তুমি সেই তারকা বিভার যে রূপরাশি দেখিয়াছ, পাতালেও দেখিবে তাহার কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই। এ তারাও তেমনি ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে, এ তারাও তেমতি সুন্দর, তেমতি উজ্জ্বল, তেমতি ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ, তেমতি স্বর্গীয় রূপে-রূপবতী, তেমতি স্নিগ্ধ, তেমতি মনোহর, তেমতি জ্যোতির্ম্ময়ী, তেমতি

কবিত্বে পরিপূর্ণ। নীল সাগরের অনন্ত জল রাশিতে ইহার বিভা সমান তেজে বিনির্গত হইতেছে। অন্ধকার রজনীতে যিনি সাগর-বেলায় দাঁড়াইয়া একবার স্বর্গে মর্ত্যে নেত্র-পাত করিয়াছেন, তিনিই দেখিতে পাইয়াছেন, বিভার সৌন্দর্য্য ও তেজ সর্ব্বস্থলেই অক্ষুণ্ণ ও অপরিবর্ত্তনীয় থাকে।

শুদ্ধ আকাশ পাতালে বিভার রূপ দেখাইয়া বিভাবরী দেবী ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি স্থলেও বিভার বাতি জ্বালাইয়া দিলেন। প্রান্তরে, কান্তারে, কাননে, সরোবরে, পর্ব্বতে, গহ্বরে—নিকুঞ্জে,—যেখানেই আঁধার আছে, সেই খানেই বিভার দীপ্তি ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে। দূরে থেকে দেখ বিভার শত বাতি জোনাকী জ্বালিয়া তোমার চিত্তহরণ করিতেছে। তুমি কি সে দৃশ্যের শোভা দেখিয়া বল নাই, ঐ জগৎ যথার্থই কাব্য-ময়? দূরে থেকে যে কুঞ্জে কুঞ্জে-পুঞ্জে বিভার বাতি-জ্বালা দেখিয়াছ, একবার নিকটে গিয়া দেখ, আর ও কত শোভা বিভার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। কোথাও স্তবকে স্তবকে, কোথাও এক একটি, কোথাও প্রকাণ্ডে, কোথাও গোপনে কত বর্ণে কত ফুল, কোথাও উজ্জ্বল ভাতিতে কোথাও কমনীয় কান্তিতে, কোথাও কোমল সৌন্দর্য্যে, কোথাও বিমল বিভায় তোমার চক্ষে রূপ-রাশি ছড়াইয়া দিয়াছে। সে রূপ কি শুধু দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে দিবে, তোমাকে সৌরভে আমোদিত করিয়া অতি কোমল ও নীরব ভাষায় বলিবে,—আমার রূপে যে কেবল সৌন্দর্য্য আছে এমত নহে, এ রূপ—সৌরভের ভাণ্ডার, কোমলতার আধার, বিমলতার আদর্শ, দেবতার ভূষণ, এবং শান্তির নিকেতন।

জলে, স্থলে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে, সর্ব্বস্থলেই অন্ধকারে বিভার বিমোহন কান্তি দেখিয়া, যখন তোমার নয়ন পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তখন বিভাবরী আর এক নূতন বেশে বিভার সৌন্দর্য্য দেখাইতে গেলেন। তিনি বিভায় কিরীটিনী হইলেন। অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে বিভা তাহার শিরোভূষণ হইল। তখন বিভাবরী বিভার রাজ-রাজেশ্বরী। জগন্ময় তখন বিভার কৌমুদীময় ঐশ্বর্য্য ছাইয়া দিলেন। জগৎ যখন এই কৌমুদীর ঐশ্বর্য্যে হাসিতেছে, সে হাসিতে যোগ দিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে প্রসূন সকল আপনাদের রূপরাশির বিমোহন বিভা দেখাইতে সদর্পে প্রকাশিত হইল। কার বিভা ভাল বলিবে? কৌমুদীর স্নিগ্ধ বিভা? না প্রসূনের সুকুমার বিভা? কার বিভায় অধিক সৌন্দর্য্য? কৌমুদীর জগৎব্যাপ্ত বিস্তারিত বিভায়, না কুমুদিনীর ক্ষুদ্র আয়তনে রাশীকৃত রূপের বিভায়? হায় বিভা, তোমার কি বিমোহিনী শক্তি! তুমি কৌমুদীর বিমোহিনী শক্তি-প্রভাবে জগৎকে মুগ্ধ করিয়া নিস্তব্ধ করিয়া ফেলিলে—জগৎ তখন বিভাবরীর ক্রোড়ে সুখে ও স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে লাগিল। জগৎকে নিদ্রাভিভূত করিয়া মোহিনী বিভাবরী কি করিতে গেলেন? সুধাকরের সুশীতল স্নিগ্ধ বারি লইয়া ধীরে ধীরে শিশিরপাতে উদ্ভিদ জগৎকে সতেজ করিতে লাগিলেন। আর জীব জগৎকে ক্রোড়ে বিশ্রাম দিয়া

সতেজ করিয়া নিশার শেষ শোভা দেখাইবার জন্য নবজীবনে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। জগৎকে নবজীবনে পুনর্জ্জীবিত করিয়া এক নূতন চক্ষে বিভার আর এক নূতন সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য কিয়ৎকালের জন্য তাহাকে নিদ্রাভিভূত করিলেন। যাঁহার শিরে সুধাকরের সুধা-ভাণ্ডার, তাঁহার কি কখন সঞ্জীবনী শক্তির অভাব হয়? তিনি নির্জ্জীবনায় সকলকে অচেতন করিতে পারেন। এখন জগৎ এত নিস্তব্ধ, এত নীরব যে এই সময়ই বুঝি কোন যোগ-সাধনার উপযুক্ত অবসর। নিস্তব্ধ জগতে বিভাবরীদেবী বুঝি একবার যোগিনী সাজিলেন। যে বিভাবস্থ তাঁহাকে এত রঙ্গে সজ্জিত করিয়াছেন, একবার বুঝি তাঁহারই ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। সমীরণ সহস্র ফুলের ধন-সম্পত্তি হরণ করিয়া স্বর্গাভিমুখে ধূপদানে ব্যস্ত রহিল। দীপ রূপে চন্দ্র জ্বলিতে লাগিল। নিশির শিশির পবিত্র বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। তারকাবলি পুষ্প-রত্ন রূপে শোভা পাইতে লাগিল। সমীরণ চারিদিকে সুস্বর ধ্বনি করিয়া মৃদু মৃদু বহিতে লাগিল। এমত নিস্তব্ধ কালে, এমত সুস্থির ভাবে, এমত পূজোপকরণে কি কেহ কখন সূর্য্যারাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? বিভাবস্থ যোগিনীর আরাধনায় যেন অস্থির হইয়াই ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। তখন উল্লাসে ধ্যানমগ্না বিভাবরীদেবী জীব-জগতের প্রাণীগণকে একে একে নিজ সঞ্জীবনী গুণে জাগাইতে লাগিলেন।

এবার বিভাবস্থ উদিত হইবেন। প্রাচ্যদেশে তাঁহার প্রথম বিভা দেখিবার জন্য জগৎ সহস্রলোচনে চাহিয়া রহিল। সেই বিভার জন্যই যেন কুঞ্জে কুঞ্জে পক্ষী সকল অপেক্ষা করিয়া আছে। পুষ্প সকল ফুটিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। সমীরণ সুশীতল ও পবিত্র হইবার জন্য সমুদ্রে স্নান করিতেছে। শিশির পাতায় পাতায় পতিত হইয়া শাখীগণকে সতেজ করিয়া নবশোভায় সজ্জিত করিয়াছে। সুধাকর নিজ সুধাদানে মৃতপ্রায় জগজ্জনকে বাঁচাইবার জন্য ধীরে ধীরে কৌমুদী-আধারে সুধাবর্ষণ করিতেছেন। সুধা-সিক্ত কৌমুদী কিছু নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে। ব্রাহ্মণগণ পূজোপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। সন্তাপিত ও ভাবনা-যুক্ত জনগণ পূর্ব্বাভিমুখে চাহিয়া আছে। দিশাহারা পথিক একদৃষ্টে এক মাত্র আশার দিকে চাহিয়া আছে। এত ঔৎসুক্যে কি কেহ স্থির থাকিতে পারেন? জগতের আশার ন্যায় বিমল দ্যুতিতে অনন্ত সাগর হইতে পূর্ব্বদিকে বিভাবস্থর প্রথম বিভা বিকাশিত হইল। আর জগতের উল্লাস দেখে কে? ঐ আশার দীপ্তির মত সুখতারা উদিত হইয়াছে। উষাদেবী কি মোহনবেশে জগতে দেখা দিলেন। এত সৌন্দর্য্য কি আর কাহার আছে? বিভার অতুল্য বিশদবরণে তাঁহার বদনদেশ শোভিত। সুখতারার সিন্দুর বিন্দু তাঁহার ললাটে। দেবী হাসিয়া হাসিয়া যেন উল্লাসে নিকুঞ্জে গাহিয়া উঠিলেন। কমল-রূপ নয়ন খুলিয়া চারিদিক

চাহিয়া দেখিলেন। সে নয়নে নিরমল প্রেম-অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সৌরভে আমোদিত হইয়া সুস্নিগ্ধ সমীরণ-সহচরী জীবগণকে স্পর্শ করিয়া জাগরিত করিতে গেলেন। প্রেমিকা প্রভাবতী সতী প্রভাকরের পূজার জন্য প্রভারঞ্জিত পুষ্প সকল আহরণ করিতে আসিল। যে ঋষিগণের গাত্রে বিভার লাবণ্য ফুটিয়াছে, তাঁহারা পবিত্র বারিতে স্নাত হইয়া পূজায় বসিলেন। পূজায় তিনি উষার এই প্রথম বিভাতে নারায়ণের মূর্ত্তি দেখিয়া গাহিয়া উঠিলেন—

নমো জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি বিভাকরং।

প্রতিধ্বনি গম্ভীরে গাহিল :—
প্রণতোঽস্মি বিভাকরং।

ঋষি আবার গাহিলেন—ওঁ

"পবিত্র গগনে, পবিত্র কিরণে,
পবিত্র ভাস্কর ওঁ।
নব সমুদিত, বিশ্ব-আলোকিত,
নমো বিভাকর ওঁ।
তিমির নাশিয়া, উদ্ধারিলে যথা,
বিশ্ব চরাচর ওঁ।
পাপ বিনাশিয়া, লও পুণ্য পথে
নমো বিভাকর ওঁ।"

হিন্দুঋষি যেথানে এইরূপ বিশ্বরূপী অনন্ত দেবের আভাস পাইয়াছেন, সেই থানেই তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন—গায়ত্রীর গম্ভীর বাক্যে তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন। তাঁহার জবাকুসুমসঙ্কাশ বিভাকরের উপাসনা জড়োপাসনা নহে ; জড়োপাসনা কাহাকে বলে হিন্দু তাহা জানিতেন না ;—হিন্দু কেবল বিশ্বরূপী অনন্ত দেবের অনন্তমূর্ত্তির উপাসনা করিয়াছেন।*

বহির্জ্জগতের যে চিত্র প্রদর্শিত হইল, মানবের অন্তর্জ্জগতেও তদনুরূপ একটি চিত্র আছে। আমাদের অন্তর্জগতেও সন্ধ্যা আছে, তমিস্রা রজনী আছে, রজনীর মধ্যে—তারকা, চন্দ্রোদয়, জ্যোৎস্নার বিভালোক—সকলই আছে। শৈশব কালে মানব যখন নিষ্পাপ ও নির্দ্দোষ থাকেন, তখন তিনি দিবালোকে হাসিতে থাকেন। মায়ারূপিণী যশোদা দেবী তাহাকে লালন পালন করিতে থাকেন। তাহার কতই ক্রীড়া দেখেন। তাহার হৃদয়-বৃন্দাবন শত শশীর বিভায় আলোকিত থাকে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে মানবের বিষয়-বাসনা

* আমি এখানে একটু পুঁথি বাড়াইয়াছি। তাহার কারণ আছে। আধুনিক ইংরাজীওয়ালারা মনে করেন, হিন্দুরা সূর্য্যস্তোত্রে জড়ের উপাসনা করেন। একথা ঠিক নহে। হিন্দুরা কোন কালে কোথাও জড়ের উপাসনা করে নাই। ইংরাজী Nature শব্দ হিন্দুর "প্রকৃতি" শব্দের ঠিক প্রতিশব্দ নহে। ইংরাজিতে যাহাকে Nature-Worship বলে, হিন্দুর পূজা সেরূপ Nature-Worship নহে। তিনি বাহ্য স্থূল জগতে যেথানে দেবভাবের বিকাশ দেখিয়াছেন, সেইথানেই সেই স্থূলকে ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম দেবতারই পূজা করিয়াছেন। এইরূপে হিন্দু অনন্ত নারায়ণের তেত্রিশ কোটি দেবরূপ কল্পনা করিয়াও পরিতৃপ্ত হয়েন নাই। মানব কি সেই অনন্তদেবকে তেত্রিশ কোটি রূপে নিঃশেষ করিতে পারেন? ইহা কেবল মানব-জ্ঞানের সীমা মাত্র, অনন্ত দেবতার শেষ নহে।

যত বাড়িতে থাকে, মানবজীবন তখন বিষয়বাসনা-রূপিণী যমুনা কূলে কংস-রাজ্য মথুরার অনুরূপ ধারণ করে। ভোগে ও মায়ায় মানব-আত্মা যতই জড়িত হয়, ততই আত্মার মলিনতা জন্মে। মানবজীবনে তখন সন্ধ্যা হয়। সন্ধ্যার পর ঘোর অন্ধকারময়ী রজনী আইসে। এই রজনীতে বিষয়ের সুখ সকল মানব—জীবনকে কথঞ্চিৎ আলোকিত করে। এই সুখ সকল তারকার ন্যায় সেই অন্ধকারে জ্বলিতে থাকে। মানবের এই যৌবনের প্রারম্ভে তাহার সমুদায় ভোগ-বৃত্তির উদ্রেক হয়। ক্রমশঃ উহারা বলবতী হইতে থাকে। এ সময়ে মানবের রিপু সকল যখন বলবান্ হইয়াছে, মানব যখন উন্মত্তপ্রায় হইয়া কার্য্য করিতেছেন তখন তিনি কংস—তাহার হৃদয়-রাজ্য মথুরা, তাহার প্রবৃত্তিস্রোত যমুনা। যৌবনের এই উদ্যোগী অবস্থাকেই মানবের জাগ্রৎ অবস্থা বলে। এই জাগ্রৎ অবস্থা যতই বাড়িতে থাকে, ততই মানব জীবনের ভোগ ও ঐশ্বর্য্য বাড়িতে থাকে। ঐশ্বর্য্য-ভোগের সহিত মানবজীবনে দ্বারকা উপস্থিত হয়। কুরুক্ষেত্রের (কার্য্যক্ষেত্রের) যুদ্ধেই মানবের ভোগ ও জাগ্রৎ অবস্থার শেষ। তখন বিজয়ী ধর্ম্মরূপী যুধিষ্ঠির বিষয়-ভোগের সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত পথে আইসেন। সে যাহা হউক, মানবজীবন যখন পাপ তাপের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, যখন কেবল বিষয় সুখের তারকারাজি অন্তঃপুর আলোকিত করিতেছে, যখন কংসরাজ তাহার হৃদয়-সিংহাসন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রাজ্যভোগ করিতেছেন, যখন ধর্ম্ম-ভক্ত বাসুদেব, ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-রূপিণী দেবকী কারাবদ্ধ, তখন কি মানব একদা পাপতাপে অনুতপ্ত হইয়া পুণ্যপথের পথিক হইতে চাহেন না? যদি চান, তখন কি হৃদয়ে ঘোর গণ্ডগোল উঠে না? এক দিকে পাপ-প্রবৃত্তি সকল বলবতী, অন্যদিকে পুণ্যপ্রবৃত্তির ক্রম-স্ফূর্ত্তি। হৃদয়ে এই পাপ পুণ্যের তুমুল সংগ্রাম,—ঘোর যুদ্ধ। এই তুমুল সংগ্রামে হৃদয়ের দেব ভাবেরই জয়। দেবভাব ধীরে ধীরে জয়ী হইতে থাকে। দেবভাবের ঈষৎ বিভা হৃদয়ে উদয় হইতে থাকে। ঘোর ঝঞ্ঝাবাত ও ঝড় বৃষ্টির মধ্যে নারায়ণের আবির্ভাব হয়। হৃদয়ে পুণ্য জীবনের প্রভাত হইতে থাকে। ইহাই কৃষ্ণের জন্ম—ইহাই হৃদয়-রজনীর চন্দ্রোদয়। অর্দ্ধরাত্রে এই চন্দ্রোদয় হয় বলিয়া এই হৃদয় রজনীকে একদিন অষ্টমীর রাত্রি বলা যাইতে পারে। এই মহা অষ্টমীতে যখন হৃদয়ে একদা, দেবালোকের আবির্ভাব হয়, মানব তখন তাহাকে এক দুর্লভ রত্ন মনে করেন। যে হৃদয়ে পুণ্য, সেই হৃদয়েই পাপ, পুণ্য পাপেরই অন্তরঙ্গ। পাছে পাপের প্রাবল্যে আবার পুণ্যের বিনাশ হয়, এজন্য সাধু সেই পুণ্য রত্নকে, সেই গলকন্দার হীরক বিভাকে সেই অতলস্পর্শের মুক্তা-বিভাকে অতি যত্নে রক্ষা করেন। বিষয়-বাসনা স্রোতের যমুনা পার করিয়া সে রত্নকে অন্তরঙ্গ কংসের ভয়ে হৃদয়ের অতি নিভৃত দেশে সঞ্চিত করিয়া রাখেন। এই নিভৃত দেশ,

গোপালয়—গোপালয় হৃদয়ের দেবালয়—এই দেবালয় আনন্দ ধাম—ইহাকেই নন্দালয় বলে। এই নন্দালয়ে দেবভাব ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ হইয়া কংসকে জয় করে। তখন বসুদেব ও দেবকী মুক্ত হয়েন। হৃদয়ে জ্যোৎস্না ফুটে। আর্য্যঋষির হৃদয়ে যখন একদা এই রূপে দেববিভার উদয় হইয়াছিল, .যখন ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের বিভায় তাহার অন্তঃপুর আলোকিত হইয়াছিল, তখন তিনি সেই জন্মাষ্টমীতে নারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে আর্য্যঋষির ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ। জীব এখন কর্ম্মী। তিনি ক্রমশঃ ধর্ম্মভাবে প্রবৃদ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন তিনি দেখিলেন, অন্তরের আসুরিক পশুভাবের এখনও প্রাবল্য রহিয়াছে। সমুদায় ইন্দ্রিয়ের শক্তি প্রবল রহিয়াছে। এ চৈতন্য তাহার পূর্ব্বে ছিল না। তখন তিনি নিকৃষ্ট পশুভাবকে পরম অসুর বলিয়া জানিতে পারিলেন। এই জ্ঞান-বিভায়, চৈতন্য হওয়াতে অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত তেজ ও বীর্য্য ধর্ম্মোন্মুখী হইল। অন্তরের সিদ্ধিদায়িনী বুদ্ধিও ধর্ম্ম-রক্ষিণী হইল। জ্ঞান (সরস্বতী) ঐশ্বর্য্য (লক্ষ্মী) তেজ (কার্ত্তিকেয়) ও সিদ্ধিদায়িনী বুদ্ধি (গণপতি) একত্রিত হইয়া ধর্ম্মোন্মুখী হওয়াতে অন্তরে যে অপূর্ব্ব ভগবৎ শক্তির (ভগবতী) উপচয় হইল, সেই শক্তি-প্রভাবে তিনি সেই অসুরকে (মহিষাসুর) পরাজয় করিলেন। এই জয়ের নাম দুর্গোৎসব। অন্তরে এখন দ্বারকার উদয়। অন্তরে ভগবৎশক্তি সকল অসুরকে জয় করিতেছে। কিন্তু এখনও অন্তঃপুর নিষ্পাপ হয় নাই। পাপ রক্ত-বীজের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ বাড়িতেছে। শ্যাম তখন শ্যামারূপিণী হইয়া ধর্ম্ম-অসি করে ধারণ করিয়া সমস্ত পাপ-বীজ নির্ম্মূল করিলেন। তখন ধর্ম্মাধর্ম্মের আন্তরিক সংগ্রাম থামিল। মন ধর্ম্মভাবে সুস্থির হইল। ইন্দ্রিয় বিজিত হইল। আজি হৃদয়ে জগদ্ধাত্রীর উদয়। এখন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি ধর্ম্মবলে বলবতী হইল। কার্ত্তিকেয় অন্তরের ধর্ম্মরাজ্য অধিকার করিলেন। এইরূপে ঋষি-হৃদয়ে সম্পূর্ণ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইলে অন্তরে বৃন্দাবন ফুটিল। ধর্ম্মজয়ের আনন্দ-কুসুম সকল বিকসিত হইল। হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। সমুদায় অন্তঃপুর সেই কুসুমে পরিপূর্ণ। প্রেম-পরিমলে সেই কুসুম সকল আমোদিত। মানব-প্রকৃতি এখন আত্মার বশীভূত ও ক্রীড়ণক। আজি হৃদয়ের রাস। ধর্ম্মের পূর্ণশশী অন্তরে উদয় হইযাছে। প্রকৃতি-সুন্দরী পুরুষের ধর্ম্মরমণে মাতিয়াছেন। এ উন্মত্ততা কি হৃদয়ে ধরে। তখন অন্তরে এক নূতন জীবন উপস্থিত। তখন অন্তরের বসন্তকাল। হৃদয়ের সমস্ত শক্তি এক নবজ্ঞান-বিভায় জীবিত হইতেছে। কর্ম্মকাণ্ডের শেষ হইয়াছে; জীব এখন জ্ঞানী। তিনি যে তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী হইলেন; বসন্ত পঞ্চমীর জ্যোৎস্নার মত সেই তত্ত্বজ্ঞান অন্তরকে প্রভাসিত করিল। তত্ত্বজ্ঞানরূপিণী সরস্বতী হৃদয়ে বিরাজিত। এই নবদ্বার বিশিষ্ট দ্বারকাপুরে এখন ভগবান্ রাজা। কে আজি দ্বারকার ঐশ্বর্য্য দেখে! আজি যোগী

সিদ্ধ হইয়া বিভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার সাধনা জ্ঞান সমাধিতে মগ্ন হইয়াছে। সেই জ্ঞানমগ্ন আর্য্যঋষির হৃদয়ে আজি দেবদোল। সমস্ত অন্তর্জ্জগৎ ভগবানকে লইয়া রমণ করিতেছে। সকল প্রবৃত্তি, সকল অনুরাগ, কেবল ভগবান্ জ্ঞানেই মোহিত। তত্ত্বজ্ঞানের এই নবানুরাগে সমুদায় অন্তঃপুর রাগরঞ্জিত হইল। প্রকৃতিদেবী আজি পুরুষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা ও দোদুল্যমান। কিন্তু আজিও যোগীর হৃদয় সবীজ সমাধিতে মগ্ন। তাঁহার পূর্ব্বসংস্কার সকল আজিও নিস্তেজ হয় নাই। এখনও আত্মার সম্পূর্ণ মলিনতা ঘুচে নাই। সবীজ আত্মা নির্বীজ হইতে চায়। এই স্থলে আর এক মহা সংগ্রাম উঠিল। এখন ভগবৎ শক্তি কেবল জ্ঞান অস্ত্রে সজ্জিত। চিত্তের সংস্কার সকল শত রূপ (দুঃশাসনাদি) ধারণ করিয়া দুর্য্যোধনের মত পরাক্রমী হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তিরূপিণী দ্রৌপদী লাঞ্ছিত হইয়াছেন। জ্ঞানের সহিত আজি সংসার-বীজের তুমুল সংগ্রাম। ভগবান (কৃষ্ণ) জ্ঞানরূপে অবতীর্ণ হইয়া আজি ধর্ম্ম, বলও বীর্য্যকে উত্তেজিত করিতেছেন। ধর্ম্ম, (যুধিষ্ঠির) বল (ভীম) ও বীর্য্য, (অর্জ্জুন), তত্ত্বজ্ঞানে বলীয়ান হইয়া সংসার-বীজ নির্ম্মূল করিতে চলিল। আজি কুরুকুল ধ্বংস হইবে। তত্ত্বজ্ঞান সাত্ত্বিক বীর্য্যকে এ ধ্বংসের পক্ষে গীতায় উপদেশ দিলেন। নহিলে আত্মা মুক্ত হইবে না। এই উপদেশের পরেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাঁধিল। কুরুকুল ধ্বংস হইল। চিত্তের সংস্কার বীজ অন্তঃপুর হইতে একেবারে উন্মূলিত হইল। ভক্তি এখন পূর্ণকাম হইয়া সাধনা ও যোগপথের শেষে আসিয়াছেন। এখন এই ভক্তি, সাধনা ও যোগ সকলেরই শেষ হইয়াছে। জ্ঞান সমুদ্রের এক মহোচ্ছ্বসিত তরঙ্গে অন্তরের সমুদায় বৃত্তি ও সংস্কার ভাসিয়া গেল। কুরুকুল ধ্বংসের পরই যদুকুল ধ্বংস হইল। অন্তরে এখন চিত্তলয় উপস্থিত। এই চিত্তলয়ের নাম যদুকুল ধ্বংস। আত্মা এখন চিন্ময় মাত্র। ভগবান একাকী বিদ্যমান। তিনি পরমাত্মাতে লয় হইবেন। আর্য্যঋষি তখন নির্বীজ সমাধিতে সিদ্ধ হইলেন। এই সিদ্ধির ছবি কি সুন্দর! যোগসিদ্ধির বিভায় আত্মার মলিনতা ঘুচিয়া গেল। তখন আত্মা চিরন্তন সুখস্বরূপ—চিরন্তন বিভাস্বরূপ—সেই বিভাবসু পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। আত্মার রজনী শেষ হইয়াছে। ঐ যে অন্তঃপুরে কি এক অপূর্ব্ব রাগরঞ্জিত বিভার আভাস দেখা দিল, ঐ বুঝি আত্মার উষাকাল। ঐ অনন্ত সুখের তারকা উঠিয়াছে। ঐ পরমাত্মার আভা দেখা দিয়াছে। উহার বিভা কতই উজ্জ্বল! অন্তরে আর আনন্দ ধরে না। সাত্ত্বিক কাননের পক্ষীগণ উল্লাসে গাহিয়া উঠিল। দিশাহারা পথিকের ন্যায় আত্মা পথ দেখিতে পাইলেন। উষার আলোকে জ্যোৎস্না মিলাইতে লাগিল। আত্মার মলিনতা ও অন্ধকার ক্রমে সমুদায় অপসারিত হইল। একে একে কাননের সিদ্ধি কুসুম কলি ফুটিয়া উঠিল। শান্তিরূপিণী বিমল বিভাবতী সতী আসিয়া পূজোপহার জন্য কুসুম সকল আহরণ করি-

লেন। জবাকুসুম-সঙ্কাশ-অরুণরূপী পরমাত্মার আবির্ভাব হইল। জীব মুক্ত হইলেন। বিভাবসুর মুখ সন্দর্শন করিবামাত্র মলিনতাযুক্ত আত্মার মুক্তিলাভ হইল। রজনী যেমন দিবসের বিভায় মিশাইয়া যায়' আত্মাও তেমনি পরমাত্মার আলোকে মিশাইয়া গেলেন। অন্তঃপুরে চিরসুখ ও চির-আনন্দ দিবা-বিভার ন্যায় প্রভাসিত হইল। এই বিভাই—বিভা। এই বিভা লাভ করিয়া কবে আমরা চির সুখী হইব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

জাতিভেদ।

মানুষ একা বাস করিতে পারে না। অনেকে একত্র হইয়া বাস করে। অনেকে এক জায়গায় বাস করিলেই বিদ্যা বুদ্ধি বল অনুসারে কেহ বড় কেহ ছোট হয়। দশজনে একত্র বাস করিতেছে ও সুখে স্বচ্ছন্দে আছে দেখিয়া আর দশজনে আবার তাহাদের সঙ্গে মিশিবার চেষ্টা করে। মিশিতে হইলে যাহারা পূর্ব্ব হইতে রহিয়াছে তাহাদের সঙ্গে নবাগতগণের একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয় এইরূপে সমাজের উৎপত্তি হয় এবং আইন কানুনের প্রয়োজন হয়। আইন কানুন সকল দেশেই আছে; ছোট বড় সকল দেশেই হয়। যে দেশে যে বড় হয় সে আপনার পুত্র প্রৌত্রাদিও যাহাতে বড় হইয়া থাকিতে পারে তাহার চেষ্টা করে। ইহা হইতেই বড় বংশের উৎপত্তি হয়। প্রাচীন দেশেই বড় বংশ ছিল ও আছে। একবার বড়বংশ জন্মিয়া গেলে সেই বংশের কতকগুলি অধিকার জন্মিয়া যায়। আমাদের দেশেও তাহাই জন্মিয়াছে। তবে আমাদের দেশে বিশেষ এই যে কি বড় কি ছোট সকল বংশই বংশানুক্রমিক অধিকার ভোগ করিতেছে এবং সে অধিকারের পরিবর্ত্তন হইবার যো নাই। এইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় বংশানুক্রমিক অধিকারের নাম জাতিভেদ। এই জাতিভেদ আমাদের দেশে কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহার ইতিহাস পাওয়া বড় কঠিন এবং এই ইতিহাস সম্বন্ধে অত্যন্ত মতভেদও আছে। আমার সাধ্য মধ্যে যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাই এ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইবে। প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত এজন্য ইহাতে সকল মতের সমালোচনা করা অসম্ভব।

ঋগ্বেদ আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে এক পুরুষ সূক্ত ভিন্ন অন্য

কুত্রাপি জাতিভেদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ শব্দ ঋগ্বেদের দুই এক স্থলে পাওয়া যায় কিন্তু সে স্থলে মাধবাচার্য্য উহার অর্থ স্তোতা লিখিয়াছেন। ঋগ্বেদে ক্ষত্র শব্দ আছে, কিন্তু উহার অর্থ বল, ঋগ্বেদে বিশ্ শব্দ আছে, সংস্কৃতে বিশ্ শব্দের অর্থ বৈশ্য কিন্তু ঋগ্বেদে উহার অর্থ প্রজা। এখনও সংস্কৃত বিশাম্পতি শব্দের অর্থ রাজা। যদি বিশ্ শব্দে শুদ্ধ বৈশ্য বুঝাইত তবে বিশাম্পতি বৈশ্যদিগের রাজা বুঝান উচিত ছিলইত, কিন্তু তাহাত বুঝায় না। এখনও বিশাম্পতি রাজা বুঝায়। সুতরাং বিশাম্পতি শব্দের মধ্যগত বিশ্ শব্দ এখনও সাধারণ প্রজা বুঝায়। ঋগ্বেদ মধ্যে বৈশ্য ও শূদ্র শব্দ এক পুরুষ—সূক্ত ভিন্ন আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। কিন্তু নানা কারণে পণ্ডিতেরা পুরুষসূক্তকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

অতএব ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কোন উল্লেখ নাই। উহাতে আর্য্য ও কৃষ্ণ এই দুইটী জাতির উল্লেখ আছে, আর্য্যগণ যাজ্ঞিক; উহারা পাঁচভাগে বিভক্ত। কিন্তু এই পাঁচভাগ কি কি তাহার কোথাও উল্লেখ নাই। যাস্ক বলেন পাঁচভাগ অর্থে গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুর ও রাক্ষস। উপমন্যু বলেন পাঁচজন বলিতে ব্রাহ্মণাদি জাতি চতুষ্টয় ও নিষাদ বুঝায়। যাস্ক উপমন্যুর বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু উহাতে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না।

পাঁচভাগে বিভক্ত আর্য্যগণ কৃষ্ণগণের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকিতেন। তখন শূদ্রবলিয়া কোন বর্ণ আর্য্যসমাজের অন্তর্গত হয় নাই। যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ব বেদে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যের উল্লেখ আছে শূদ্রের উল্লেখ নাই। শতপথ ব্রাহ্মণেও শূদ্রজাতির উৎপত্তির কোন কথা নাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যকে সর্ব্ব প্রথম শূদ্রজাতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

বৈদিক সময়ের শেষ ভাগেই এইরূপ শূদ্রজাতি উল্লেখ থাকায় অনেকে মনে করেন যে, যে কৃষ্ণবর্ণ জাতির সহিত আর্য্যগণের পূর্ব্বে ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে ছিল? তাহাই পরিণামে দাস ও শূদ্র নামে অভিহিত হইয়াছিল।

যদি আর্য্য বিরোধী দাসগণ শূদ্র হইল তবে দুইমাত্র জাতি হইল, আর্য্যও শূদ্র। ব্রাহ্মণাদি কোথা হইতে আসিল?

এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে দেখিতে হইবে সাধারণ আর্য্যগণ বিশ শব্দে অভিহিত হইত। তখন ইহার মধ্যে পাঁচভাগ থাকিলে ও জাতিভেদ ছিলনা। ক্রমে যাজ্ঞিকগণ আপনাদের ক্ষমতা বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ যে কেহ যাজ্ঞিক হইতে পারিত; পরে যাজ্ঞিকের সন্তান সন্ততি না হইলে যাজ্ঞিক হওয়ার পক্ষে যাজ্ঞিকগণ বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিলেন। যাহারা বলবান্ ছিল তাহারাও আপনারা ঐরূপ দল বাঁধিতে লাগিল, রাজার সন্তান সন্ততি না হইলে রাজা হইতে পারিত না। অতি পূর্ব্বকালে এক আধ জন বৈশ্য এমন কি (একজন শূদ্রও যাজ্ঞিক) হইয়াছিলেন শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পরে যাজ্ঞিকগণ রাজাদিগকেও যজ্ঞ করিতে

দিবেন না স্থির করিয়াছিলেন; রাজারা বলবান ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহারা সহজে যজ্ঞ করিবার অধিকাব ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ইহা লইয়া বৈদিক সময়ে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহাদি হইয়া গিয়াছে। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের যুদ্ধ কোন হিন্দুরই অবিদিত নাই। বেন, পুরূরবা, নহুষ ও নিমি প্রভৃতি রাজগণ ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব কিছুতে স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁহারা স্বয়ংই যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতেন এই জন্য ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল রাজাকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন এবং উহাদিগকে অধর্ম্মচারীর আদর্শ স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহারা সৎস্বভাব ও প্রজাপালক ছিলেন কেবল ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করাতেই উহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। জনক রাজা ছিলেন, কয়েকজন ব্রাহ্মণকে অগ্নিহোত্রের যথার্থ অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নিকট উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। গর্গ্যবালকী কাশ্য অজাত-শত্রুর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। শ্বেতকেতু আরুণেয় প্রবহন জৈবালির নিকট যজ্ঞ সম্বন্ধীয় অনেক গূঢ় রহস্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা বিশন্তর আপনার কুলপুরোহিতগণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যলোক দ্বারা যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন। পরে যখন নিজে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে কুল পুরোহিতগণ বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন তখন তাহাদিগকে স্বকার্য্য প্রদান করিলেন।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষদাদিতে উল্লেখিত এই সকল ঘটনা দ্বারা, বোধ হয় যে আর্য্যগণের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর লোকে নিজেই যজ্ঞাদি করিতেন ক্রমে সামাজিক উন্নতির সহিত এই উচ্চ শ্রেণীর একদল শাসন কার্য্য ও আর একদল যাজন কার্য্য লইয়া বিব্রত হইল। শাসনকর্তৃগণ সহজেই অহঙ্কৃত। তাঁহারা অনেক সময়ে আপনারাই যজ্ঞাদি করিতেন কিন্তু ব্রাহ্মণগণের এরূপ যজ্ঞাদিতে সর্ব্বদাই আপত্তি হইত। প্রথম প্রথম ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন ক্রমে সে পথ মরিয়া আসিতে লাগিল। ব্রাহ্মনেরা প্রবল হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে পৌরহিত্য কার্য্য হইতে একেবারে বঞ্চিত করিলেন। ব্রাহ্মণ একজাতি হইল; ক্ষত্রিয় আর একজাতি হইল এবং সাধারণ আর্য্যগণ বৈশ্যরূপে পরিণত হইল। আর্য্যগণের মধ্যে এইরূপ তিনটী জাতি সৃষ্টি হইতে যে কত শতাব্দী লাগিয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে? এবং ব্রাহ্মণদিগের এই প্রাধান্য লাভ করিতে যে রক্ত পাত হইয়াছিল কত যুদ্ধ বিগ্রহাদি হইয়াছিল তাহাই বা কে বলিতে পারে? আমরা রামায়ণে নানা স্থানে দেখিতে পাই যে সত্যযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ সমান বীর্য্যশালী ছিলেন; ত্রেতা যুগে ধর্ম্মরক্ষার্থ চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল।

বৈদিক শাস্ত্র হইতে আমরা যাহা জানিতে পারি তাহা কথিত হইল; এক্ষণে স্মৃতি শাস্ত্র হইতে যাহা জানা যায় তাহাও কথিত হইতেছে। মনু বলেন ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চারি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এবং অঙ্গের ঔৎকর্ষ

তারতম্য অনুসারে জাতিসমূহের ঔৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ণীত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাই এই সকল জাতির ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং জাতি না মানিলে এবং বৃত্তির বিপর্য্যয় করিলে ব্রহ্মার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় এবং তাহাতে পাপ আছে। স্মৃতিও পুরাণ সমূহ এবিষয়ে প্রায়ই মনুর সহিত একমত।

এইরূপে জাতির বিভাগ ঈশ্বরকৃত স্বীকার করিয়া ঋষিগণ দেখিলেন জাতি ঠিক চারিটী নহে, উহা অসংখ্য। চারি জাতি বলিলে এত জাতি কোথা হইতে আসিবে? অথচ চারির উপর পাঁচ জাতি স্বীকার করিলেই ঈশ্বরাজ্ঞা অনর্থক হইয়া পড়ে এই জন্য তাঁহারা এই চারি জাতি হইতেই অন্যান্য সমস্ত জাতির উৎপত্তি হইয়াছে প্রমাণ করিতে বসিলেন; বলিলেন,

ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠোনাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে।
ইত্যাদি।

এই সকল বচন দ্বারা অন্যান্য সমস্ত জাতিকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া ঈশ্বরাজ্ঞা বলবতী করিলেন কিন্তু বর্ণসঙ্করেও সকল জাতির উৎপত্তি ঠিক হয় না। এই জন্য তাঁহারা আরও বলিলেন যে কতক গুলি জাতি ক্রিয়া লোপ হেতু বৃষল হইয়া গিয়াছে। বর্ণসঙ্কর ও ক্রিয়া লোপ এই দুইটী মাত্র উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহারা পৃথিবীর যাবতীয় জাতির উৎপত্তি স্থিরকরিয়া দেন। মনুর মতে পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রবিড় কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খসাদি জাতি ক্রিয়াশূন্য ক্ষত্রিয়। বা ইহাদের মধ্যে পৌণ্ড্রগণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পশ্চিম বাঙ্গালায় বাস করিত, ইহাদের বংশাবলি এখনও পুঁড়ো বা সাধু ভাষায় পুণ্ডরীকাক্ষ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। ওড্রগণ উৎকলে বাস করিত। দ্রবিড়গণ দ্রাবিড়ে কাম্বোজগণ আফগানিস্থানের অন্তর্গত কাম্বো-নামক স্থানে, যবন গ্রীসে, শকগণ তাতারে, পারদ ও পহ্লবগণ পারস্যে বাস করিত। চীনগণ এখনও চীনসাম্রাজ্যে কিরাতগণ নেপালে, দরদগণ দার্দ্দিস্থানে এবং খসগণ পূর্ব্ব বঙ্গের পর্ব্বত মালায় বাস করে। মনু এই সকল জাতিকে চাতুর্ব্বর্ণ্যের বহিঃস্থিত এবং পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন এই সকল জাতির মধ্যে অনেকে আর্য্যভাষাও ব্যবহার করে; অনেকে ম্লেচ্ছ ভাষায়ও কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে; তাহাতে বোধ হয় অনেক আর্য্য জাতিও চাতুর্ব্বর্ণ্য ভুক্ত হয় নাই। মনু আর এক স্থানে বলিয়াছেন ব্রাহ্মণাদি বর্ণ গায়ত্রী হীন হইলে ব্রাত্য হয় তাহারা চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে গণ্য নহে। ব্রাত্যদিগের উপর স্মৃতিসংহিতাকারদিগের বড় রাগ। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে অথর্ব্ব বেদ এই ব্রাত্যকে অতি উচ্চ পদ প্রাদান করিয়াছেন ঐ বেদে ব্রাত্য যদি কোন রাজার বাড়ী যায় তবে সেবাড়ী পবিত্র হইয়া যায়। ব্রাত্যের মহিমা বর্ণনার্থ অথর্ব্ব বেদের একটী পূর্ণ অধ্যায় আছে তাহা পাঠে ব্রাত্যকে এক প্রকার ঐশ্বরিক শক্তি বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। তবে ব্রাত্যর উপর সংহিতাকারগণের এত রাগ কেন? ব্রাত্যগণ ব্রাহ্মণ

মানিত না ইহা ভিন্ন আর কি কারণ হইতে পারে? অনু দ্রুহ্য তুর্ব্বশু প্রভৃতি যযাতি পুত্রগণকে পুরাণকারেরা ম্লেচ্ছ জাতির পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু ঋগ্বেদে উহাদের জন্য কত সুক্তই যে উক্ত হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। ইহা দেখিয়া কি মনে হয়? দ্রুহ্য তুর্ব্বশু প্রভৃতি গণ আর্য্য জাতি মধ্যে গণ্য ছিল; পরে তাহাদের সন্তানেরা ব্রাহ্মণের আধিপত্য স্বীকার করে নাই বলিয়া তাহারা ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই রূপে আমরা বুঝিতে পারি, কেন না মনু সংহিতার কতক গুলি আর্য্য ভাষী লোকেও চাতুর্ব্বর্ণ্যের বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছেন। ঋগ্বেদের সময়ে যাহারা আর্য্য ছিল তাহাদের মধ্যে অনেকে চতুর্ব্বর্ণের বাহির হইয়া পড়িল। যে পাঞ্জাব দেশে ঋগ্বেদের জন্মভূমি একথানি ব্রাহ্মণে সেই পঞ্জাবকে কতই শাপ দিয়া গিয়াছেন। পঞ্জাব ঋগ্বেদের জন্মভূমি। কিন্তু মনু বলিলেন যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশই সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্য ভূমি। পঞ্জাবের নামও নাই। এই সকলে স্পষ্টই বোধ হয় যে ঋগ্বেদের আর্য্যগণ মনু সংহিতার চতুর্ব্বর্ণ হইতে অনেক অংশে স্বতন্ত্র জাতি। দুই একখানি স্মৃতিতে ও অনেকগুলি পুরাণে আমরা শূদ্রজাতির পর অন্তজ নামে আর একটি জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহারা অতি নিকৃষ্ট জাতি। ইহারা চতুর্ব্বর্ণের বাহিরে। কিন্তু ইহাদিগকে পুরাণ কারেরা পঞ্চমবর্ণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যে সকল জাতি এই পঞ্চমবর্ণের অন্তর্গত আমরা তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি এবং মুসলমান ও খৃষ্টান হইতে তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। বাঙ্গালায় এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক,। যেমন আর্য্যগণ এক সময়ে শূদ্রগণকে আপনাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, সেইরূপ এক সময়ে এই অন্তাজ বর্ণাক্রান্ত জাতি দিগকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন এবং উহাদিগকে শূদ্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট পদবী প্রদান করিয়াছেন। চতুর্ব্বর্ণের সহিত এই পঞ্চম বর্ণের মিলিত হইবার কথা বলার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের কয়েকটি প্রধান প্রধান ঘটনা পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

এই সকল ঘটনার মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং শঙ্করাচার্য্য ও কুমারিলভট্ট কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার প্রধান।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি মনুসংহিতাকার ব্রহ্মর্ষি দেশকেই সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্য ভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহার পর ব্রহ্মাবর্ত্ত, তৎপরে মধ্যদেশ, তাহার পর আর্য্যাবর্ত্ত, ক্রমে স্বল্পতর পুণ্য ভূমি। আমরা আরও দেখিতে পাই যে এই মধ্যদেশের মধ্যে এক জন পাঞ্চালের রাজা ব্রাহ্মণদিগকে উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে বিদেহ এবং কাশীর রাজারাও ব্রাহ্মণদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বোধ হয় পূর্ব্বাঞ্চলের ক্ষত্রিয়গণ পড়াশুনার বিলক্ষণ চর্চ্চা রাখিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেক চিন্তাশীল লোকও ছিলেন। পাঞ্চালরাজ আপনার ব্রাহ্মণ শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন

যে এ সকল গূঢ় তত্ত্বে ক্ষত্রিয়েরই অধিকার, ব্রাহ্মণের অধিকার নাই।

এই পূর্ব্বাঞ্চলীয় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে ইক্ষ্বাকুবংশে ভগবান্ শাক্য সিংহের জন্ম হয়। তাহার জন্ম গ্রহণের ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বিদেহ দেশস্থ বৈশালী নগরে ভগবান্ নিগ্রন্থনাথের জন্ম হয়। ইনি জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। প্রথম প্রথম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বীগণ—ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলেন নাই, তাঁহারা প্রচলিত আচার ব্যবহার মানিয়া চলিলেন; সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাহাদের বিরোধ ঘটিত না। বুদ্ধ ও নিগ্রন্থনাথের শিষ্যগণ সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইতেন, যে ভিক্ষু হইল সে স্মৃতি আচার মানিত না। কিন্তু তাহাতেও ব্রাহ্মণগণের আপত্তি ছিলনা। স্মৃতি ও আচার সংসারীর জন্য, বৈরাগীর জন্য নহে। যে সকল সংসারী ব্যক্তি এই শাক্য ও জৈন ভিক্ষুদিগের আহার যোগাইত ও তাহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, তাহারা স্মৃতির আচার অনুসারে চলিলে, ব্রাহ্মণেরা তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না।

আর এক কথা ব্রহ্মর্ষিদেশ হইতে এত দূর প্রদেশে ব্রাহ্মণগণের সংখ্যাও আধিপত্য অধিক ছিলনা। এইরূপে দুই শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধ ও জৈনগণ নিরীহভাবে মগধে বাস করিতেছিল। পরে যখন অশোক রাজার সময়ে বৌদ্ধগণের প্রভাব বাড়িয়া উঠিল, রাজা নিজে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া নানাদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক পাঠাইয়া দিলেন তখন বৌদ্ধপ্রচারকগণ সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালা দেশে প্রথম প্রবেশ করিল। বাঙ্গলায় তৎকালে ব্রাহ্মণ ছিল কি না সন্দেহ। মনু যে সকল প্রত্যন্তবাসী ক্রিয়াহীন ব্রাহ্মণ দর্শনশূন্য অতএব বৃসলত্ব প্রাপ্ত জাতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে পৌণ্ড্র ও কিরাত নামক দুই জাতি আছে। কিরাতগণ মিথিলার উত্তর পূর্ব্বে ও পৌণ্ড্রগণ ঠিক পূর্ব্বাংশে বাস করিত, সুতরাং পৌণ্ড্র দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্গ, বঙ্গ দেশে সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র আধিপত্য ছিলনা। এই জন্য বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিলক্ষণ বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল এবং ব্রাহ্মণেপেক্ষা অধিক কাল আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশের উপর এত চটা ছিলেন যে তাঁহারা বলিতেন বঙ্গদেশে আসিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মনুর সময় বঙ্গদেশের উপর এ রাগ ছিলনা, বঙ্গদেশ আর্য্যবর্ত্তের চতুঃসীমার অন্তর্গত। তবে ব্রাহ্মণদের এ রাগ হয় কেন? শুদ্ধ বাঙ্গালা বৌদ্ধদেশ বলিয়া। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, ও মগধ এই কয়েকটী দেশের উপরই ব্রাহ্মণগণের রাগ, এবং এই কয়েকটী দেশই বৌদ্ধ অথবা জৈন প্রধান।

শঙ্করাচার্য্য দুই ব্রাহ্মণগণের দমনের জন্য বেদোদিত অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন এবং বিরোধিমতাবলম্বিদিগের পরাজয়ার্থে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু তিনি মগধ ও বঙ্গদেশে আগমন করেন নাই। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল ছিল এবং ব্রাহ্মণগণের বিশেষ অভাব ছিল। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন নাই। আমরা

আরও দেখিতে পাই কুমারিলভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার প্রামাণ্য সংস্থাপন করিলে ভারতের অন্যান্য দেশে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধদিগের প্রভাবও কমিতে লাগিল। কিন্তু মগধ ও বঙ্গে এরূপ হয় নাই। মগধ ও বঙ্গ দেশবাসী যেরূপ বৌদ্ধ ছিলেন সেইরূপই রহিয়া গেলেন। শঙ্করাচার্য্যের কিছুকাল পরে চীনদেশের পরিব্রাজক হিয়াত্থসাঙ্ মগধ ও বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তখন এই উভয় দেশেই কান্যকুব্জাধীশ হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের অধীন ছিল। তিনি বাঙ্গালার যে সকল নগর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন সে সকল দেশেই বহুসংখ্যক বৌদ্ধ মন্দির এবং অনেক বিধর্ম্মীগণের মন্দিরও ছিল। এই বিধর্ম্মী কাহারা, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। তৎকালে বঙ্গদেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আরও একটি ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, এই ধর্ম্মের যাজকগণ পণ্ডিত শব্দে অভিহিত হইতেন। আমরা তমালাবদান পুস্তকে দেখিতে পাই যে তৎকালে ভারতবর্ষে তিন প্রকার ধর্ম্মযাজক ছিল; পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ। এখনও বঙ্গদেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অনেক পণ্ডিত যাজক দেখিতে পাওয়া যায়। হিয়াত্থসাঙ্ বোধ হয় এই পণ্ডিতদিগের অনেক মন্দির দেখিতে পাইয়া ছিলেন। কান্যকুব্জ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার কিছু দিন পরে বাঙ্গালা ও মগধে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হয়। পাল রাজাদিগের সময়ে আমরা দেখিতে পাই এক জন ব্রাহ্মণ প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া ছিলেন, এবং প্রধান মন্ত্রিত্ব তিন চারি পুরুষ ধরিয়া সেই ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, বোধ হয় বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভাবের এই সূত্রপাত। কিন্তু যেমন পালরাজগণের রাজত্ব কালে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভাবের সূত্রপাত হয়, সেইরূপ অপরদিকে পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধদিগের অনেক টা একাকার হইয়া যায়। আমরা ধর্ম্ম মঙ্গলে গ্রন্থ দেখিতে পাই যে পাল বংশীয় ধর্ম্মপাল নামক রাজার অধিকার সময়ে ধর্ম্মের পূজা প্রচার হয়। রমাই বাইতী এই ধর্ম্মের যাজক ছিলেন। কালু ডোম এই ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে লাউসেনের বিশেষ সহায়তা করিয়া ছিলেন এবং পরিণামে ডোমেরাই ধর্ম্ম পূজার প্রধান পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন। আমার বোধ হয় ধর্ম্ম পূজা বৌদ্ধ ধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র। বৌদ্ধ রাজার সময় উহার প্রাদুর্ভাব, বৌদ্ধদিগের রত্নত্রয়ের মধ্যে ধর্ম্ম রত্নই উহার উপাস্য দেবতা এবং যে সে জাতি লোকই উহার যাজক হইতে পারে। বিচক্ষণ পালরাজগণ নিম্নশ্রেণীর অনার্য্যদিগকে এই রূপে আপনাদিগের ধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া আপনাদের প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

ক্রমে পালবংশের প্রভাব ধ্বংস হইলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা স্বাধীন হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বৌদ্ধ ছিলেন এবং কতকগুলি হিন্দুও ছিলেন। যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা সহজেই যজ্ঞাদি করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন, দেশে ব্রাহ্মণাদি থাকিলেও সে সকল ব্রাহ্মণ দ্বারা যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন

হইয়া উঠিত না। তাই তাঁহাদিগকে বিদেশ হইতে অন্ততঃ পাঁচজন করিয়া ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবার জন্য আনয়ন করিতে হইত। আমরা "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক পুস্তকে দেখিতে পাই যে আদিশূর ভিন্ন অন্য দুই তিন জন রাজাও যজ্ঞার্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। আদিশূর রাজার ব্রাহ্মণ আনয়নের কথা সকলেই অবগত আছেন, তিনি একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি যে রাজার নিকট ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠাইয়া ছিলেন তিনিও একজন পরাক্রান্ত ভূপতি। এইজন্য তাঁহাকর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণগণের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন ভিন্ন আদিশূরসম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। তাঁহার কয়েক পুরুষ পরে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন অতি পরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন। আমাদের দেশের বদ্ধমূল সংস্কার এই যে বল্লালসেন অন্যান্য জাতিদিগকে ব্রাহ্মণ প্রদান করিয়া হিন্দু করিয়া লইয়া ছিলেন এবং বাঙ্গালার জাতি সম্বন্ধে একটা পাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যান। বল্লালসেনের বন্দোবস্ত আজিও চলিয়া আসিতেছে।

আমি এতক্ষণ বর্ণধর্ম্মের উৎপত্তি ও বাঙ্গালার পূর্ব্ব ইতিহাস লইয়া আপনাদিগের অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি। কিন্তু বোধ হয় আপনারা আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। বঙ্গদেশের জাতিমালা প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিতে গেলে যে সকল কথা নিতান্তই প্রয়োজন হয়, আমি শুদ্ধ তাহাই যতদূর পারি সংক্ষেপে বলিয়াছি। বল্লালসেন জাতিসম্বন্ধে কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহার যদ্যপি একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ থাকিত তাহা হইলে আপনাদিগকে অদ্য এতক্ষণ সময় নষ্ট করিতে হইত না।

বল্লাল সেন কি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। বাঙ্গালার জাতি সম্বন্ধে আমরা শূলপাণি-প্রণীত প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক গ্রন্থ হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারি। মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির মত বঙ্গদেশে আদরণীয়। তিনি আপনাকে সাহড়িয়ান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সাহড়ি শব্দে রাঢ়ীয় শ্রেণীয় ভরদ্বাজগোত্রীয় একটি গাঁই বুঝায়। শূলপাণি যখন আপনাকে সাহড়িয়ান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও শ্রোত্রিয় ছিলেন। বঙ্গদেশে স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার কথা অত্যন্ত প্রামাণিক। তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতিত স্বীকার করিয়াছেনই, তাহার উপর নানাশ্রেণীর অন্যান্য জাতিরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি অপস্তম্বের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন রজক, নট, বাগুকর, চর্ম্মকার ও কৈবর্ত্ত আদির অন্ন, জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিলে অর্দ্ধ চন্দ্রায়ণ করিতে হয়। কাপালিকার অন্ন ভোজন করিলেও সেই ব্যবস্থা। কিন্তু চণ্ডাল খপচ ক্ষত্তা, সূত, বৈদেহিক, মাগধ প্রভৃতির অন্নভোজন করিলে পূর্ণচান্দ্রায়ণ করিতে হয়।

আমরা দেখিতেছি, শূদ্রের অন্ন আহারের পক্ষে শূলপাণির নিয়ম অন্যান্য জাতির অন্ন আহারের ন্যায় কঠিন নহে। তিনি বলেন আপৎকালে বিপ্র যদি শূদ্র গৃহে শূদ্র

অন্ন ভোজন করে তাহা হইলে মনস্তাপের দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে। প্রতিগ্রহ সম্বন্ধেও তিনি বলেন শূদ্রের নিকট প্রতিগ্রহ করিলে অর্দ্ধ চান্দ্রায়ণ, গৌণ্ডিক, ব্যাধ, নিষাদ, বন্ধ, চর্ম্মকার প্রভৃতির নিকট প্রতিগ্রহ করিলেও অর্দ্ধ চান্দ্রায়ণ, কিন্তু চণ্ডালাদির নিকট প্রতিগ্রহ করিলে পূর্ণ চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। স্পর্শ সম্বন্ধেও তিনি বলেন চণ্ডাল স্পর্শ করিলে স্নান, ঘৃতপ্রাশন ও মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হয়, কিন্তু চর্ম্মকার, রজক, বেণ, ধীবর ও নটকে স্পর্শ করিলে আচমন দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে। তাহারা যে অঙ্গ স্পর্শ করিবে সে অঙ্গ ধৌত করিতে হইবে, মস্তক স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইবে। কিন্তু বৌদ্ধ ও মূর্দ্ধফরাস স্পর্শ করিলে সবস্ত্র স্নান করিতে হইবে ও ঘামশ বার মৃত্তিকা লেপন করিতে হইবে। চণ্ডালের কূপস্থ জল পান করিলে ব্রাহ্মণকে ত্রিরাত্র উপবাস করিতে হয়, কিন্তু শূদ্রের জল খাইলে পঞ্চগব্যের জল অথবা কুশোদক পান করিলে শুদ্ধ হইয়া যায়। কোন অন্ত্যজ জাতি যদি কূপ খনন করিয়া দেয়, সেই কূপের জল পান করিলে পঞ্চগব্য সেবা করিতে হয়। এতদ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে খুলপাণি অন্ত্যজ জাতিগণকে রজকাদি ও চণ্ডালাদি এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং কৈবর্ত্তদিগকে রজকাদির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

সিপাই যুদ্ধে ব্রিটিশনীতি।

১৮৫৭ অব্দের যে ভয়ঙ্কর বিপ্লবে সমস্ত ভারতবর্ষ আন্দোলিত হয়; বাঙ্গালা উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, মধ্যদেশ যাহার অভিঘাতে মুহুর্মুহুঃ তরঙ্গায়িত হইয়া সাধারণের সম্মুখে যুগপৎ আশা ও আশ্বাস, আতঙ্ক ও আকুলতার রাজ্য বিস্তার করিতে থাকে; সুদূর দক্ষিণাপথে যাহার গতি প্রসারিত হইয়া সকলকে সমান সন্ত্রস্ত ও সমান বিচলিত করিয়া তুলে, তাহার মর্ম্মভেদী ইতিহাস অনেকে অনেক রূপ লিখিয়া গিয়াছেন। এই ইতিহাসে আমরা এক সময়ে যেমন করুণার মোহিনীচ্ছবি ও ন্যায়ের জলন্ত প্রতাপ দেখিয়া স্তম্ভিত হই, অন্য সময়ে তেমনই পাপের প্রগাঢ় কালিমা, কঠোরতার হৃদয়বিদারক দৃশ্য ও বিষাদের ঘোরতর অন্ধকার দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া থাকি। কোন কোন ন্যায়পর ঐতিহাসিক সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাসের চিত্র যথাযথ অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন বটে, কিন্তু অনেক অদূরদর্শী স্বজাতিপ্রিয় লেখকের দোষে ঐ ইতিহাস অনেক স্থলে কলঙ্কিত এবং অনেক স্থলে বা অতিরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ভারতের একখানি সুসম্বদ্ধ ইতিহাস প্রণীত ও প্রচারিত হয় নাই। বাল্মীকি ও বেদব্যাসের লীলাভূমি, ধনা ও লীলাবতীর জন্মস্থান, বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্যের উত্তরক্ষেত্র, প্রতাপসিংহ ও শিবজীর কীর্ত্তিনিকেতন এখনও অনেকের নিকট অনেক বিষয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা ভারতের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বিদেশী। তাঁহাদের লেখনীগুণে অনেক বিষয় যথাযথ প্রতিফলিত হইলেও যে দূরদর্শিতা বা সমদর্শিতার অভাবে অনেক বিষয় আবার বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহিযুদ্ধের কাহিনীও এইরূপ অস্পষ্ট, অসংলগ্ন ও অতিরঞ্জিত। কোনও ভারতবর্ষীয় আজ পর্য্যন্ত এই বিপ্লবের একখানি প্রণালীবদ্ধ ইতিহাস প্রচার করেন নাই। এস্থলেও বিদেশিগণই এই বিদেশীয় বিপ্লবের কথা জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল বিদেশী এই বিপ্লবের তরঙ্গাবর্ত্তে পড়িয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা পুস্তকাকারে, প্রকাশ্য সংবাদপত্রে বা বন্ধুজনের নিকট গোপনীয় লিপিতে উহার বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মোহিনী কল্পনায় উদ্ভ্রান্ত হওয়াতে ইহাঁরা প্রকৃত ইতিহাসের যথোচিত সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহাঁরা যে বিপদে পড়িয়াছিলেন সেই বিপদই শতগুণে পল্লবিত করিয়াছেন, যে যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন সেই যুদ্ধেই আপনাদের স্বজাতীয়গণের অলৌকিক বীরত্ব ও অসাধারণ ক্ষমতার বিকাশ দেখিয়াছেন, যে অত্যাচার সহিয়াছেন সেই অত্যাচারই সমগ্র ভারতের অনুষ্ঠিত বলিয়া ঘৃণা ও বিরাগের সহিত ভারতবাসীদিগকে মূর্ত্তিমান্ মহাপাপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাঁদের লিপি পটুতা, ইহাঁদের অভিজ্ঞতা, ইহাঁদের সমদর্শিতা -সমস্তই অনুচিত স্বজাতিপ্রিয়তার তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়া গিয়াছে। ইহাঁরা বর্ণনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, কষ্টসহিষ্ণুতার প্রমাণ দেখাইয়াছেন, বৈষয়িক জ্ঞানের আভাস দিয়াছেন, কিন্তু সমদর্শিতার সহিত ইতিহাসের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং ইহাঁদের প্রচারিত গ্রন্থ ইহাঁদের লিখিত লিপি বা ইহাঁদের বর্ণিত ঘটনা সকল প্রকৃত ইতিহাসস্থানীয় না হইয়া কল্পনাময়ী আখ্যায়িকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে সকলেই যে এরূপ অন্ধ বিশ্বাস বা এইরূপ অন্ধ স্বজাতিপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন, আমরা সে কথা বলি না। অনেক ইঙ্গরেজ সমদর্শিতার পরিচয় দিয়া প্রকৃত ইতিহাসের সম্মান রাখিয়াছেন; কিন্তু ইহাঁদের সংখ্যা অতি অল্প এবং ইহাঁদের বর্ণনাও অনেক স্থলে অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ বর্ণনা হইতেও আমরা অনেক সময়ে নিগূঢ় সত্যের আভাস পাইয়া থাকি। ঐতিহাসিক বিষয়ের আলোচনার সময় ইহাতে আমাদের অনেক উপকার হইয়া থাকে। আমরা উপস্থিত প্রবন্ধে এই সকল লেখকের সাহায্যে সিপাহিযুদ্ধের সম্বন্ধে একটী গুরুতর বিষয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব

অনেক ইঙ্গরেজ লেখক সিপাহিবিপ্লবের ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া উত্তেজিত সিপাহিদিগের পৈশাচিক ব্যবহার ও গুরুতর নিষ্ঠুরতার বর্ণনা করিয়াছেন। সিপাহিরা কিরূপে ইউরোপীয়দিগকে দলে দলে হত্যা করিয়াছিল, কোমলপ্রাণ বালক বালিকাদিগকে সঙ্গিনের উপর ফেলিয়া দিয়া কিরূপে ভীষণ শোণিত-তরঙ্গিণীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখাইয়াছিল, অসহায় মহিলাদিগকে কিরূপে তরবারির আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা ইহারা নিদারুণ ক্রোধ ও নিদারুণ অনুশোচনার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়ে উত্তেজিত সিপাহিগণ যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। ইহাদের অভিজ্ঞতা বা দূরদর্শিতা ছিল না। কিরূপ অবস্থায় পড়িলে কিরূপ কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয়, তাহা ইহারা জানিত না। গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির মর্ম্মোদ্ভেদে ইহাদের সামর্থ্য ছিল না। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলে পরিণামে যে কি হইবে তাহা ইহারা বুঝিত না। বিবেক ও ন্যায়পরতা ইহাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দেয় নাই। কর্ত্তব্যবুদ্ধি ইহাদের অন্ধকারময় কার্য্যক্ষেত্রে আলোকবর্ত্তীর স্বরূপ হয় নাই। দয়া ও কোমলতা ইহাদিগকে সমবেদনা দেখাইতে প্রবর্ত্তিত করে নাই। গুরুতর উত্তেজনার সময়ে যখন "কোম্পানির মুলুক রসাতলে গেল" বলিয়া জনরব উঠিতে লাগিল, এই জনরব যখন বাতাসের উপর ভর করিয়া বিদ্যুৎবেগে বাজারে বাজারে প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন ইহারা সকলেই কোম্পানির বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়া কোম্পানির ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। এই গভীর উত্তেজনার আবেগে ইহাদের রাজভক্তি অন্ন জ্ঞানের বিপত্তিপূর্ণ তরঙ্গাঘাতে নিমজ্জিত হইয়া গেল। যে বিপ্লব মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আপনার সংহারিণী শক্তির পরিচয় দিয়া সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে, তাহার আঘাতে কেহই স্থিরতার সীমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। সিপাহিগণও এই সময়ে সুস্থির থাকে নাই। তাহারা চারি দিকে অরাজকতা দেখিয়া আপনারাই সেই অরাজকতার সীমা অধিকতর বিস্তৃত করিতে উদ্যত হইল। কোম্পানি লোকাচার বা দেশাচারের অনুবর্ত্তী না হইয়া পূর্ব্বে যে সকল অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় এখন উত্তেজিত জনগণের স্মৃতিপথে জাগরূক হইল। ইহারা পূর্ব্ব হইতেই কোম্পানিকে বিদেশীয় ও বিজাতীয় দল বলিয়া জানিত, যেহেতু ইহাদের দেবতা কোম্পানির দেবতা ছিল না; ইহাদের চিত্তবৃত্তি কোম্পানির চিত্তবৃত্তির সহিত মিশিয়া যাইত না; ইহাদের অনুশাসন, ইহাদের আচার ব্যবহার ও ইহাদের রীতি নীতি, কোম্পানির অনুশাসন, কোম্পানির আচার ব্যবহার ও কোম্পানির রীতিনীতির সহিত এক শ্রেণীতে সমাবেশিত হইত না। সুতরাং ঘোরতর বিপ্লবের সময় ইহারা কোম্পানির সহিত সমবেদনা দেখাইল না; বরং ছুরাশায় বুক বাঁধিয়া স্বদেশ হইতে সমস্ত বিদেশীয় চিহ্ন বিনষ্ট করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইল। ইহাদের অনেকে কার্য্যে

অনলস, মন্ত্রসাধনে তৎপর, সংগ্রামে নিপুণ, মৃত্যুতে নির্ভীক এবং ধর্ম্মোন্মাদে অধীর ছিল। সুতরাং ইহারা কিছুতেই নিরস্ত হইল না। ইহারা সম্মুখে যাহা কিছু পাইল, তাহাই লুঠিয়া লইতে লাগিল এবং বিদেশী যুবক বৃদ্ধ বালক বালিকা স্ত্রী পুরুষ যাহাদিগকে দেখিল, তাহাদেরই শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিয়া ফেলিল। উন্মত্ততা, নির্ভীকতা ও অনভিজ্ঞতার আবেগে ইহাদের সাধুবৃত্তি সকল পর্য্যুদস্ত হইয়াগেল।

ভারতের উত্তেজিত সিপাহিগণ এক সময়ে গভীর উত্তেজনার আবেগে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া এইরূপ লোমহর্ষণ কার্য্য সাধন করিয়াছিল। ইতিহাসে এই সকল কথা গোপনে রাখিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। অনভিজ্ঞ ও অদূরদর্শী লোকে সহসা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পরিণাম তাহারা পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখে না; সুতরাং সিপাহিবিপ্লবের পরিণাম না ভাবিয়াই নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর লোকে এক এক সময় নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সকল বিষয়ও ইঙ্গরেজলেখকেরা অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই সময়ে ইঙ্গরেজ কুলনারীর প্রতি ঘোরতর অত্যাচারের কথা প্রকাশ করিয়া ইঙ্গরেজেরা সাধারণকে চমকিত করিয়া তুলেন। সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে এ-সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।—"উত্তেজিত পশুপ্রকৃতি লোকের পাশব প্রবৃত্তিতে কোমলমতি কোমলাঙ্গী মহিলারা, অবিবাহিতা সরলতাময়ী যুবতীরা কিরূপ নিগৃহীত হইয়াছিলেন নিরহ ও কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়া নিষ্ঠুর লোকের অস্ত্রাঘাতে কিরূপে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এই সময়ের অনেক সংবাদ পত্রে, অনেক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়া সহৃদয় পাঠকের মনে নিদারুণ ক্ষোভ, রোষ ও ঘৃণার আবেগ তুলিয়া দেয়। কিন্তু এই সকল বর্ণনা যে প্রকৃত ঘটনামূলক সে বিষয়ে কেহ কোনরূপ বিশদ প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। লেখকেরা, বোধ হয়, অনেক স্থলে মোহিনী কল্পনায় উদ্ভ্রান্ত হইয়াই আপনাদের এই রূপ বিভীষিকাময়ী বর্ণনায় পাঠকদিগকে চমকিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন"। একজন সহৃদয় ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এই সকল ঘৃণিত অত্যাচারের বর্ণনা কেবল বাজার গুজবের উপর স্থাপিত হইয়াছিল কিম্বা নিম্ন শ্রেণীর নিরক্ষর লোকের কথা শুনিয়া ঐরূপ বর্ণনা করা হইয়াছিল। এই সকল লোক বেশ জানে যে, যে কথা যতই অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত করা যায়, সে কথা অপরের মনোযোগ ততই আকর্ষণ করিয়া থাকে। বোধ হয় সে সময়ের উচ্চশ্রেণীর লোকে এইরূপ অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত কাহিনীতে অপরের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করেন নাই। অত্যাচারের যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা কেবল মানবের উচ্চতর কল্পনাতেই শোভা পায়। ঘোরতর দুরাচারের অবতারেরাই কেবল সেই সকল অমানুষিক ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে। ইঙ্গরেজ মহিলাদের উপর যে অত্যাচারের উল্লেখ

করা হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মণ হউক বা ক্ষত্রিয় হউক, বিজাতীয় হিন্দুগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেই তাহাতে জাতি নষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহাদের চরিত্র ও আচারও এইরূপ পাপকার্য্যের একান্ত বিরোধী। যে সকল গুজর সর্ব্বদা পরস্বাপহরণ করিয়া বেড়ায়, তাহারাও এইরূপ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা লুঠ পাঠ ব্যতীত আর কিছুতেই মনোযোগ দেয় না। সম্পত্তি হরণের অনুরাগে বিবাহিতা মহিলার পরম আদরের ধন, বিবাহের অঙ্গুরী টানিয়া লইতেও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে। ইহাতে যে মহিলার পবিত্র বন্ধনের পবিত্রতা নষ্ট হইবে, তাহা তাহারা বুঝে না। বস্তুতঃ এই পবিত্রতা নষ্ট করিবার জন্যই তাহারা উক্ত অঙ্গুরী অপহরণ করে না। মুসলমানের কথা স্বতন্ত্র। কোরাণের উপদেশের সম্বন্ধে আমরা যাহাই মনে করি না কেন, নাম মাত্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বিজেতারা ইউরোপের যুদ্ধে নগর সমূহ যে রূপে উৎসন্ন করিয়াছিলেন, তাহার যে লোমহর্ষণ চিত্র ইতিহাসে রহিয়াছে, তাহার তুলনায় উপস্থিত সময়ের দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠুরতার বিবরণ যে অধিকতর ভয়ঙ্কর সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।"

একজন সমদর্শী ইংরেজ ঐতিহাসিক এইরূপ উদারভাবে ভারতবর্ষের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। উত্তেজিত সিপাহিরা যেরূপ প্রকৃতির লোক ছিল, যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, যেরূপ সময়ে দুশ্চিন্তার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল এবং গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির দোষে লোকের কুমন্ত্রণায় যেরূপ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের অত্যাচার ক্রিয়দংশে মার্জ্জনীয় হইতে পারে। কিন্তু ইংরেজ রাজপুরুষ সুশিক্ষিত ও দূরদর্শী হইয়া উপস্থিত সময়ে যেরূপ অত্যাচারের পরিচয় দিয়াছেন, নিরীহ লোকের শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিয়া যেরূপ নির্দ্দয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, সঙ্গদয় ঐতিহাসিকের নিকট তাহা কখনও মার্জ্জনীয় হইতে পারিবে না। এই সময়ে অধিকাংশ রাজপুরুষের বুদ্ধির স্থিরতা ছিল না, কর্ত্তব্যকর্ম্মে অভিনিবেশ ছিল না, ন্যায়পরতার গৌরব রক্ষা করিতে প্রবৃত্তি ছিল না। ভারতের নিরক্ষর জনসাধারণ যাহা করিতে সঙ্কুচিত হইত, তাঁহারা অবলীলায় তাহা করিয়াছেন। ইতিহাসে এ বিষয় ভাল আলোচনা করা হয় নাই, অধিকাংশ ইংরেজ লেখক বিদেশের অত্যাচারের কথাই পল্লবিত করিয়া গিয়াছেন—স্বদেশের অপকর্ম্মের দিকে কিছুই দৃক্‌পাত করেন নাই। কিন্তু উদার ও সমদর্শী ঐতিহাসিকগণ অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ কেবল ইউরোপেই আপনাদের অত্যাচারের পরিচয় দেন নাই, ইঁহাদের আক্রমণে কেবল ইউরোপের সুদৃশ্য লোকালয়ই বিধ্বস্ত হইয়া যায় নাই, ইউরোপের ইতিহাসই কেবল ইঁহাদের এই ভয়ঙ্কর কার্য্যের চিত্র দেখাইয়া অপরকে চমকিত করিয়া তুলে নাই। ভারতের এই সিপাহি-বিপ্লবের ইতিহাসেও ইঁহাদের প্রবল উত্তেজনা, প্রবল প্রতিহিংসা এবং তৎপ্রযুক্ত ভয়াবহ কার্য্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। দিল্লী সিপাহিদিগের হস্তগত হইলে, ইঙ্গরেজেরা যখন চারিদিকে পলাইতে থাকেন, তখন কতিপয় ইঙ্গরেজ পলায়ন সময়ে পথিমধ্যে ৭ জন লম্বরদারের (ইজারাদার) ফাঁসি দেন এবং ৪ খানি গ্রাম জ্বালাইয়া ফেলেন। যেহেতু পলায়িতদিগের সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে লম্বরদারেরা ইঙ্গরেজ মহিলাদিগকে হত্যা করিয়াছিল। আর এক জন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সৈনিক পুরুষ (সেনাপতি নীল) এলাহাবাদ হইতে যাত্রাকালে এত লোক বিনষ্ট করেন যে, শেষে তাঁহার সৈন্যদলের এক জন আফিসর আর লোক পাওয়া যাইবে না বলিয়া তাঁহাকে সেই সর্ব্বধ্বংস হইতে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সৈনিক পুরুষ নিরস্ত্র লোকদিগকে গুলি করিয়া বধ করিয়াছেন, হিন্দুর পবিত্র দেবমন্দির বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন, অধিক কি শরণাগত নিরপরাধ বালকেরও প্রাণনাশ করিয়া আপনার বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সেনাপতি হড্‌সনের পৈশাচিক ব্যবহারের কথা মনে হইলে আজ পর্য্যন্ত হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। সিপাহি-বিপ্লব যখন প্রায় শেষ হয়, তখন হড্‌সন দিল্লির তিন জন রাজকুমারকে যেরূপ নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে শোণিতাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরে এই রাজকুমারগণ আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। আপনাদের জীবন রক্ষা পাইবে এই আশায় ইঁহারা সমাধিমন্দির হইতে আপনাদের ইচ্ছায় বাহিরে আসিয়া ইঙ্গরেজ-সেনানী হড্‌সনের নিকট আত্ম সমর্পণ করেন। ইঁহাদের মুখমণ্ডলে ভয়ের চিহ্ন ছিল না। আশঙ্কার কালিমা ছিল না, নিরাশার বিষণ্ণতা ছিল না। ইঁহারা উপস্থিত হইয়া বিনয় ও নম্রতার সহিত হড্‌সনকে অভিবাদন করিলেন। হড্‌সনও প্রত্যভিবাদন করিলেন। অবশেষে হড্‌সন ইঁহাদিগকে সমাধি-মন্দির হইতে পাঁচ মাইল দূরে লইয়া গেলেন। এই স্থানে তিনি আপনার সৈন্যদ্বারা ইঁহাদের আরোহিত গরুর গাড়ী ঘেরিলেন এবং ইঁহাদের গাত্রবস্ত্র খুলিয়া স্বহস্তে ইঁহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করিলেন। কেবল এই হত্যাতেই ব্রিটিশ বীরপুরুষের ক্রোধ শান্ত হইল না। হড্‌সন, নিহত সম্রাট্-পুত্রগণের অঙ্গ, অলঙ্কার, পরিচ্ছদ সংগ্রহ পূর্ব্বক দিল্লি নগরে যাইয়া মৃত দেহ গুলি বাহিরে অনাবৃত স্থানে ফেলিয়া রাখিলেন। সুসভ্য ব্রিটিশ রাজত্বে ব্রিটিশ বীরের নিকটে এই রূপে আশ্রয়প্রার্থীর আত্মসমর্পণের গৌরব রক্ষা পাইল। ব্রিটিশ বীরপুরুষ এই রূপে মৃতবিরত শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবকে হত্যা করিয়া জগতের সমক্ষে আপনার অপূর্ব্ব বীরত্ব-কীর্ত্তির পরিচয় দিলেন। এই বীরপুরুষের মহাকীর্ত্তির গৌরব তাঁহার স্বজাতীয়গণের অনেকে উচ্চ কণ্ঠে গান করিয়া থাকেন।

যে সকল ব্রিটিশ বীরপুরুষ যুদ্ধস্থলে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, আপনাদের করায়ত্ত তরবারির উপর নির্ভর করিয়া বিজয়-গৌরব লাভের আশায় সঙ্কটকালে সাহসের একশেষ দেখাইয়াছেন, তাঁহারাও এইরূপ বীরত্বের অবমাননাও বীরপুরুষোচিত গুণের এই রূপ গৌরব নষ্ট করিতে ত্রুটি করেন নাই। যাঁহারা অস্ত্র-চালনায

দীক্ষিত ছিলেন না, সংগ্রামে সমরলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের আশায় অরাতি-নিপাতে প্রবৃত্ত হইতেন না, শান্তভাবে বিচারাসনে বসিয়া রাজ্যের শান্তি রক্ষা করাই যাঁহাদের কার্য্য ছিল, তাঁহারাও বর্ণিত সময়ে সংহারিণী-মূর্ত্তির করাল ছায়া বিকাশ করিতে কাতর হন নাই। গবর্ণমেণ্ট যে আইন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সে আইনই জীব-হত্যায় তাঁহাদের অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ ছিল। কামানের গোলা ব্যর্থ হইতে পারে, সঙ্গিনের সন্ধান বিফল হইয়া যাইতে পারে, তরবারির আঘাত লক্ষ্য পতিত হইতে না পারে কিন্তু ইহাঁদের অস্ত্রের সন্ধান কোথাও প্রতিহত, কোথাও ব্যর্থ বা কোথাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। ইহাঁরা জীববিনাশে প্রতি মুহূর্ত্তে যেরূপ তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন, যুদ্ধস্থলে সুনিপুণ বীরপুরুষের পরিচালিত অস্ত্র সেই রূপ তৎপরতা দেখাইতে পারে নাই। একটি বিভাগে উপস্থিত সময়ে গবর্ণমেণ্টের আইনের মহিমায় এই রূপে শত শত নির্দ্দোষ প্রাণীর হত্যা হয়। আয়তনে পরিমাণে ও সমৃদ্ধিতে এই বিভাগ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত। ভারতের দুইটি প্রধান নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া এই স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে। ইহা হিন্দুদিগের একটি পরম পবিত্র তীর্থ স্থান। দূরাগত যাত্রি-সমাগমে এই তীর্থস্থান এক এক সময়ে লোকারণ্যের অপূর্ব্ব দৃশ্য বিকাশ করিয়া দেয়। মোগল সম্রাটগণের সময়ও এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐ সময়ে উভয় নদীর সঙ্গমস্থানে একটি সুদৃশ্য দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ইংরাজেরা অতঃপর ঐ দুর্গই সংস্কৃত করিয়া আত্মরক্ষার উপায় বিধান করেন। এই বিভাগে অনেকগুলি সুদৃশ্য পল্লী ও সুশোভন নগর আছে। উপস্থিত সময়ে ইহাতে প্রায় দশ লক্ষ লোকের বাস ছিল এবং কেবল ভূমি হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর কুড়ি লক্ষ টাকা পাইতেন। ক্রমশঃ।

কুশীনগর।

কুশীনগর কোথায়? যে স্থানে ভগবান শাক্যসিংহ নির্ব্বাণনগরীতে অধিষ্ঠান করেন, যে স্থানে অশীতিপর বৃদ্ধ শাক্যসিংহ প্রাণ-ত্যাগ করিলে, প্রকাণ্ড শালতরুদ্বয়ের মধ্যে শয়াণ তদীয় মৃত দেহের চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্যমণ্ডলী অবিরত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করতঃ জগৎ অন্ধকারময় বোধ করিয়াছিল, সে কুশীনগর কোথায়?

যেস্থানে অশোকরাজ ৺ গুরুদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তিস্মরণার্থ প্রকাণ্ড নির্ব্বাণ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং যে স্থানে শাক্য-সিংহের নির্ব্বাণ প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সহস্রবৎসর ধরিয়া অগণিত সংখ্যক তীর্থ-যাত্রা-ভিলাষী ভক্ত বৃন্দকে আকর্ষণ করিত সে কুশীনগর কোথায়?

ভগবান শাক্যসিংহ আপনার নির্ব্বাণ প্রাপ্তির সময় সন্নিহিত জানিয়া বৈশালী নগর হইতে উত্তর পশ্চিমে কপিলবাস্তু অভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিয়ৎদূর গমন করিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া শেষবারের জন্য বৈশালীনগর দর্শন করিলেন। তখন এ ভক্ত-ভবন আর দেখিতে পাইব না ভাবিয়া তাঁহার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, অশ্রুজল গণ্ডদেশ বহিয়া পতিত হইতে লাগিল। যে স্থানে এই ঘটনা হইয়াছিল পরবর্ত্তী ভক্তগণ তথায় ও স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সে স্থানই বা কোথায়? তথা হইতে অর্হৎ বোধি-সত্ব প্রত্যেক বুদ্ধ ও ভিক্ষুগণে পরিবৃত হইয়া তাহাদিগকে নানা সদুপদেশ প্রদান করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার রোগ-যাতনাবৃদ্ধি হইয়া উঠিল; তিনি কুশীনগর সন্নিহিত প্রকাণ্ড শালতরুদ্বয়ের মধ্য স্থলে শয়ন করিলেন ক্রমে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল তিনি নির্ব্বাণ নগরীতে অধিষ্ঠান করিলেন। কিন্তু সে কুশীনগর কোথায়?

এখন সে পুণ্যভূমি নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সমস্ত ভারত পরিদর্শনকর কেহই জানে না কোথায় ভারতের গৌরব-রবির শেষ সমাধিস্থান অবস্থিত ছিল। সিংহল পূর্ব্ব উপদ্বীপ তাতার চীন প্রভৃতি দেশদেশান্তরস্থ সৌগতগণ কোথায় আসিয়া তাহাদের ইষ্টদেবের চরম মন্দির সন্দর্শনে আপনাদিগকে পূত মনে করিত এখন সেই স্থান জগতের কেহই জানে না। তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। যে স্তূপ এককালে ১৭৭ ফুট উচ্চ ছিল এখন তাহার কিছুমাত্র দেখা যায় না। কতক ভগ্ন হইয়া গিয়াছে কতক মাটিতে প্রোত হইয়াছে, কতক বন ও জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ভয়াল ভল্লুক ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ সকল তাহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে।

কিন্তু তাহাই বা কোথায়? কেহইত জানেনা; সংস্কৃত সাহিত্য এত প্রকাণ্ড তাহা-তে তু কুশীনগরের কোন ঠিকানাই পাওয়া যায় না। পালি সাহিত্য এত বিস্তৃত কিন্তু সিংহল পূর্ব্ব উপদ্বীপ তিব্বতের পালিগ্রন্থেওত তাহার ঠিকানা মিলিল না। ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রত্নতত্ত্বান্বেষী মনীষীগণ হতাশ হইয়া পড়িলেন। কালে অনন্ত স্রোতে বুঝি নির্ব্বাণ নগরীর স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছে; আর সে স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করিবার উপায় নাই।

এমন সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত স্তানিস্যা জুলিএন চীনদেশে হিয়াস্থসাঙ নামক ভারত-পরিদর্শনকারী একজন অতি প্রাচীন বৌদ্ধভিক্ষুর নাম শুনিতে পাইলেন। আরও শুনিলেন যে হিয়াস্থ-সাঙ তাঁহার ভারত পরিভ্রমণ বিষয়ে এক প্রকাণ্ড পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই বার ভারতবর্ষে প্রাচীন ইতিহাসও ভূগোলের কতক উদ্ধার সাধন হইতে পারে

ভন্নুসায় উদ্যমশীল ফরাসী পণ্ডিত চীন ভাষা অধ্যায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। যে ভাষায় ৪০০ এরও অধিক অসংযুক্ত অক্ষর, যাহার প্রত্যেক অক্ষর এক একটী কথার সঙ্গে সমান, যাহার বর্ণপরিচয় দৃষ্টেই শিক্ষার্থীগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় স্তানিস্লাজুলিএন সেই ভাষা অল্পদিনের মধ্যেই একেবারে অভ্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার অভিলাষিত হিয়াঙ্থসাঙের ভারত ভ্রমণ-বিবরণ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন।

যেমন তিমিরাচ্ছন্ন গিরিগুহাগর্ভে সৌরকর প্রবেশ করিয়া তাহাকে অলোকিত করে এই নুতন গ্রন্থের আলোকে সেইরূপ নিবিড় অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভারতবর্ষীয় ইতিহাস-গুহা আলোকিত হইয়া উঠিল। সহসা ভূপৃষ্ঠের কিয়দংশ বিদীর্ণ হইয়া গেলে যেমন ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অনুমানগম্য মৃত্তিকান্তর সকল মানব নয়নের পরীক্ষোপযোগী হয় সেইরূপ এই গ্রন্থ প্রকাশে ভারত ইতিহাসের অনেক দুর্বোধ দুর্জ্ঞেয় অনুমানের ও অগম্য বিষয় সকল প্রকাশ হইয়া পড়িল। পণ্ডিতগণ, ঐতিহাসিকগণ, প্রত্নতত্ত্বান্বেষিগণ পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

হিয়াঙ্থসাঙ একজন অদ্বিতীয় মনুষ্য ছিলেন। তাঁহার সময়ে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ ছিলনা। আসিতে হইলে তাতার ও আফগানিস্থান বেষ্টন করিয়া আসিতে হইত। বৌদ্ধভিক্ষু গুরুদেবের লীলা ভূমি পরিদর্শনার্থ ভারতীয় মনীষীগণের নিকট সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম্ম, প্রভৃতি মহাবৈপুল্য যুক্ত মহাযান গ্রন্থ অধ্যায়নার্থ মহোৎসুক্যময় অন্তঃকরণে ঘোরবিপদসঙ্কুল, অজ্ঞাত, দুর্গম, অসভ্য অৰ্দ্ধসভ্য ও বর্ব্বর জাতিগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, ভীষণ পথের পথিক হইলেন। কতশত নদ নদী পর্ব্বত কন্দর লঙ্ঘন করিয়া কতকত রাজ্য মহারাজ্য সাম্রাজ্য অতিক্রম করিয়া স্বীয় লক্ষ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় বহু বৎসর অবস্থান করিয়া হৃদয় ভরিয়া আপনার অভিলাষ পূরণ করত আবার স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

ভারতবর্ষ তাঁহার পক্ষে পুণ্য ভূমি, তাঁহার পক্ষে উহা স্বর্গ বা স্বর্গ হইতেও মনোরম। তিনি উহাকে ভাল বাসিতেন ভক্তি করিতেন এবং উহার ঘটনাবলী ও মানচিত্র হৃদয়াকাশে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেন। এই জন্য তিনি যাহা যাহা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন তাহা ভক্তি ভাবে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে লিখিয়া গিয়াছেন। যেখানে যে কয়দিন ছিলেন, যাহার যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, নিকটে যে সকল তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন, নিকটে যে সকল স্থানে বড় বড় মনীষীগণ গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন, এ সমস্তই তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার সময় যে পথে গিয়াছিলেন যত পথ পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, যাহা যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাও লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

এই অদ্ভুত গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে প্রচার হইবামাত্র ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া বসিলেন। স্থির-যৌবনা ভারত ললাম ভূতা বারাণসী গয়া ও মথুরা খুজিয়া লইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। কিন্তু অন্য অন্য যে সকল স্থানে বৌদ্ধ ভিক্ষু গমন করিয়াছিলেন তাহার ঠিকানা হইল না। পরিব্রাজকের মাপ চৈনিক মাপ; তাহাকে ভারতীয় সর্ব্বেবিভাগের মাইলে পরিণত করিতে হইল; কত "লি"তে মাইল হইবে তাহা লইয়া কত গোলমাল হইল; শেষ স্থির হইল যে ৬ লিতে এক মাইল হয়।

কিন্তু তথাপি পরিব্রাজকের দূরতার সহিত মানচিত্রের দূরতা কিছুতেই মিল হয় না। পরিব্রাজক যে স্থান গয়া হইতে ৫০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে লিখিয়াছেন সে স্থানে নগরী না হইয়া হ্রদ হইল, যেখানে পর্ব্বত গুহা পাইবার কথা সে থানে নদীগর্ভ লক্ষিত হইল, যে স্থানে রাজপ্রসাদের ভগ্নাবশেষ পাইবার কথা সে স্থানে শ্যামল শস্যপূর্ণ ধান্যক্ষেত্র লক্ষিত হইল। তখন পণ্ডিতগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন তখন তাঁহারা পরীক্ষার্থ স্থানে স্থানে দল বাধিয়া পরিব্রাজক প্রদর্শিত এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে লাগিলেন। গিয়া দেখিলেন যে মানচিত্রের দূরতার সহিত পরিব্রাজকের দূরতা অনেক বিভিন্ন হইবে। মানচিত্রের দূরতা সরল রেখায় মাপিতে হয়। কিন্তু পর্য্যটন করিতে গেলে-ত পথ ধরিয়া যাইতে হইবে; পথ ত প্রায় ঠিক সরল রৈখিক আকারে নির্ম্মিত হয় না। সুতরাং মানচিত্রের মাপেও পর্য্যটনের মাপে অনেকটা বিভিন্নতা আপনা হইতেই হইয়া উঠিবে। তাহার পর পথ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে

যে পথে পরিব্রাজক পর্য্যটন করিয়া গিয়াছিলেন, সে পথ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার পুস্তক হইতে আবিষ্কারের পথ হইল বটে; কিন্তু যত সহজে আবিষ্কারের কথা ছিল তাহা হইল না। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পর্য্যটনার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। এই পর্য্যটক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে আলেকজাণ্ডার কনিঙহাম সাহেব প্রধান। তিনি নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থে হিয়াঙ্থসাঙ প্রদর্শিত প্রদেশ সমূহের পুনরাবিষ্কারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কনিঙহাম যে সকল স্থান আবিষ্কার করিলেন, তাহা যে ঠিক হইল একথা তিনিও বলিতে পারিলেন না। সুতরাং মৃত্তিকাখনন করত পরীক্ষা করা আবশ্যক হইল। তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত ঔদার্য্য সহকারে কনিঙহাম সাহেবের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং আর্কিওলজিকাল সর্ব্বেনামক বিভাগের সৃষ্টি করিলেন। প্রাচীন স্থান সমূহের অনুসন্ধান প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির পুনরুদ্ধার, ভগ্নপ্রায় প্রাচীন অট্টালিকাদির পুনঃ সংস্কার ঐ বিভাগের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এবং আলেকজাণ্ডার কনিঙহাম সাহেব উহার ডাইরেকটর হইলেন। তখন দস্তুরমত অন্বেষণ আরম্ভ হইল। কনিঙহাম সাহেব নিজে যেমন এবিষয়ে উদ্যমশীল তাঁহার সহকারীরাও সেইরূপ উদ্যমশীল। তিনি উৎসাহদান প্রশংসা ও পরিতোষিক প্রভৃতির দ্বারা আপনার তেজেও উদ্যমে সহকারীবর্গকে তেজস্বীও উদ্যমাক্রান্ত করিয়া তুলি-

লেন। এই সকল উদ্যমশীল পরিব্রাজক পণ্ডিতগণের যত্নে পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়-বলে অনেকস্থলে ভারতের লুপ্তকীর্ত্তি সকল পুনরুদ্ধার হইতেছে হইয়াছে এবং হইবে। যতগুলি গুপ্তস্থান আবিষ্কৃত ও যতগুলি কীর্ত্তি স্তম্ভ পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কুশীনগর একটী প্রধান স্থান এবং তথাকার নির্ব্বাণ-স্তূপও নির্ব্বাণ-প্রতিমা প্রধান কীর্ত্তি।

কুশীনগর কুশীনগর নাম শুনা যাইত কিন্তু কোথায় কেহ জানিত না। হিয়াঙ্গসাঙ্গের পুস্তকে তিনি কোথা হইতে কোথায় গিয়াছিলেন তাহা লিখিত আছে। তিনি পিপ্পল বন নামক একটী স্থান হইতে কুশীনগরে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে কুশীনগরও যেমন অজ্ঞাত পিপ্পল-বন ও তেমনি অজ্ঞাত স্থান। পিপ্পল বনেযাইবার পূর্ব্বে তাহাকে অনোমানদী—বৌদ্ধদিগের একটী প্রধান তীর্থ স্থান—পার হইতে হইয়াছিল। কিন্তু উত্তরকোশলের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎ প্রবাহের মধ্যে কোন্‌টি অনোমা তাহা কেহই জানেনা। কাল-ক্রমে নদীর নাম ও পরিবর্ত্তিত হইয়াগিয়াছে। অনোমা নদী পার হইবার পূর্ব্বে হিয়াঙ্গ সাঙ রামগ্রাম নামক পুণ্য তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন; রামগ্রামের ও সন্ধান পাওয়া যায় না। রামগ্রামেআসিবার পূর্ব্বে তিনি বুদ্ধদেবের জন্ম ভূমি কপিল বাস্তু নগর দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু কই সে স্থানেরই বা নাম কে জানে? কপিলবাস্তু যাইবার সময় চীন দেশীয় পরিব্রাজক শ্রাবস্তীতে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। এই শ্রাবস্তী ভগবানের প্রিয়স্থান। এই খানেই অনাথপিণ্ডদনামক তৎকাল প্রসিদ্ধ একজন ধনী ব্যক্তি বৌদ্ধদেবের বাসার্থ জেতবন নামক উদ্যান ক্রয় করিয়া দেন। উদ্যানটী তখন শ্রাবস্তীর কোন রাজকুমারের সম্পত্তি ছিল। রাজকুমার বলিলেন আমার উদ্যান আবরণ করিতে হইলে যত স্বর্ণ মুদ্রা আবশ্যক যদি তত স্বর্ণ মুদ্রা দিতে পার তবে তোমায় আমি আমার বাগান ছাড়িয়া দিতে পারি। অনাথ পিণ্ডদ ঠিক তাহাই করিলেন। একটী একটী করিয়া স্বর্ণ মুদ্রা বিছাইয়া উদ্যানটী মুড়িয়া দিলেন। রাজকুমার মুদ্রাগুলি লইয়া উদ্যা-নটী ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু হায় সেই শ্রাবস্তীই কোথায় কে জানে। তাহার ও নাম লোপ হইয়াছে। এখন ভারতবর্ষ বাসীগণ অনাথপিণ্ডদের নামও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। এইত শ্রাবস্তী হইতে কুশী-নগর পর্য্যন্ত ৮। ১০টি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধক্ষেত্রের নামহইল ইহার একটীও লোকে জানে না।

কিন্তু এইবার আমরা বোধ হয় এই ঘোর অন্ধকারে একটু আলোক পাইব। এই অগাধ সমুদ্রের কূল কিনারা পাইব হিয়াঙ্গসাঙ শ্রাবস্তী যাইবার পূর্ব্বে বহুসংখ্যক বিধর্ম্মীপরিবৃত সরযূ তীরবর্ত্তী অযোধ্যানামক নগরে বাস করিয়া ছিলেন। অযোধ্যার নাম ভারতবর্ষ ভুলিতে পারে নাই; পারি-বেও না। কবিগুরু বাল্মীকির প্রতিভাবলে ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতার নিকট অযোধ্যা আপনার জন্মভূমি অপেক্ষা আর-রের স্থান। এই স্থানে তাহাদের জীবনের আদর্শস্বরূপ লক্ষ্মীবিজয়ী রক্ষঃ কুলবিমর্দ্দী

রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিয়াঙ্গ-সাঙএর অযোধ্যা এই অযোধ্যা এবং তাঁহার বিধর্ম্মীগণ আমরা অর্থাৎ হিন্দুগণ।

এখন আমাদিগকে এই অযোধ্যা হইতে আবার ফিরিয়া শ্রাবস্তী কপিলবাস্তু, রামগ্রাম, অনোমা পিপ্পলবন হইয়া কুশীনগরে উপস্থিত হইতে হইবে। এইবার আমরা দেখিতে পাইব আলেকজাণ্ডার কনিঙ্ঘাম সাহেব ও তাঁহার বীরহৃদয় সহকারীগণ কেমন আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ও কৌশলবলে এই সমস্ত স্থান নবাবিষ্কৃত করিয়া কুশী-নগরে উপস্থিত হইয়াছেন।

অযোধ্যা হইতে শ্রাবস্তী ৫০০ লি উত্তর। ৫০০ লিতে ইংরাজী ৮৩ মাইল। উত্তর বলিতে গেলে ত আর ঠিক উত্তর বুঝায় না। ঠিক উত্তরের একটু এ দিক ও হইতে পারে একটু ওদিক ও হইতে পারে। সুতরাং ৮৩ মাইল উত্তরে আসিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে হইল। অনু-সন্ধানে প্রকাশ পাইল যে সাহেত মাহেত নামক স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন সাহেত মাহেতই শ্রাবস্তী বলিয়া অনুমান হইল। কিছুদিন পরে ঐ সাহেত মাহেতেরই এক স্থানে খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটী বুদ্ধ প্রতিমা দৃষ্টিগোচর হইল তাহার সিংহাসনে শ্রাবস্তী নগরের নাম খোদিত আছে সুতরাং সাহেত মাহেতই যে শ্রাবস্তী সে বিষয়ে আর বিশেষ সন্দেহ রহিল না।

শ্রাবস্তী হইতে ৫০০ লি দক্ষিণ পূর্ব্বে কপিল বাস্তু। কপিল বাস্তু কোথায় ইহা-লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছিল। শেষ কপিল বাস্তু নগরও পাওয়া গিয়াছে। ভুইলাতাল নামক পুষ্করিণীর চতুঃ পার্শ্বে যে সকল ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে তাহাই কপিল বাস্তুর ভগ্নাংশ কনিঙ্ঘাম সাহেবের সহকারী কারলীল সাহেব এই স্থানে মায়া-দেবীর মন্দির প্রভৃতি প্রাচীন স্থান সকল আবিষ্কার ও নির্ণয় করিয়াছেন। কপিল-বাস্তুর কথা লইয়া স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হওয়া উচিত এজন্য তাহার সবিস্তার বর্ণনা এস্থানে করা গেল না।

কপিলবাস্তু বা ভুইলাতালহইতে ২০০লি অর্থাৎ ৩০ মাইল পূর্ব্বে রামগ্রাম। রামগ্রামে হিয়াঙ্গসাঙ বৌদ্ধ ধাতু কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত একটী প্রকাণ্ড স্তূপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে স্তূপ শব্দের অর্থ ঢিপি। পূর্ব্ব কালে নানা কারণে লোকে স্তূপ নির্ম্মাণ করিত। বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের শরীর ধাতুর কোন স্থান লইয়া অর্থাৎ নখ কেশাদি লইয়া একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিত, পরে তাহার উপর প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মাণ করিত, স্তূপ গুলির পরিমাণের কিছুই স্থিরতা ছিলনা। ৫০। ৬০। ৭০। ৮০ ফুট এমন ২০০। ৩০০ ফুট উচ্চ স্তূপের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্তূপের ব্যাস ৮৫। ৮৬ ফুট ও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। স্তূপ গুলি গোল থামের মত এবং নিরেট ইটের গাঁথনি। রাম গ্রামে এই রূপ একটি স্তূপ ছিল। এক্ষণে ভুইলাতাল হইতে পূর্ব্বে প্রায় ৩০ মাইল অন্তরে রামপুর দেওড়িয়া নামক একটী গ্রাম আছে তথাচ একটি প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় আর এই ভগ্নাবশেষ হইতে ৫০০ ফুট অন্তরে একটী স্তূপের ভগ্ন অংশ দৃষ্ট হয়।

রামগ্রামে যে স্তূপ আছে এখন তাহা উচ্চে ২০ ফুট এবং উহার ব্যাস ৮৫ ফুট।

কপিল বাস্তু হইতে ২৬০ লি অর্থাৎ ৪৩ মাইল অন্তরে অনোমানদী। অনোমা নদী বৌদ্ধদিগের একটী তীর্থ ক্ষেত্র। বুদ্ধ দেব গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার সময় অশ্বারোহণে গমন করিয়াছিলেন। অনোমা নদীই তাহার পথের প্রথম নদী তিনি অশ্বারোহণে এই নদী লম্ফত্যাগে উত্তীর্ণ হইয়া ছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কপিলবাস্তু হইতে রামগ্রাম ৩০ মাইল রামগ্রাম হইতে সোজা রাস্তা পাওয়া যায় না অনেক নদী নালা ঘুরিয়া তামেশ্বরনাথ নামক শিব মন্দিরের নিকটে একটী নালা আছে। সেটি প্রায় ১৩ মাইল হইবে। নালার নিকটে কতকগুলি বৌদ্ধ মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে। নদীর নাম এখন অনোমা নাই; উহার নাম হইয়াছে "কডোয়া" যাহার উপর কেহ লম্ফ দিয়া পার হইয়াছিলেন। উহা অন্য সময়ে অতি সামান্য নদী থাকে, বর্ষায় অত্যন্ত প্রবল হয়। কারলীল সাহেব এই নদীকেই অনোমা নদী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। উহার দূরত্ব কপিল বাস্তু হইতে ঠিক ৪৩ মাইল। ললিত বিস্তরে বলে যে কপিল-বাস্তু হইতে অনোমা ৬ যোজন ৭ মাইলে যোজন ধরিলে ৪২ মাইল।

এই অনোমা নদী পার হইয়াই ভগবান সংসারীর চিহ্নস্বরূপ রাজবেশ পরিহার পূর্ব্বক ভিখারীরর বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া ছিলেন এবং ছন্দকনামে তাঁহার যে ভৃত্য এতদূর সঙ্গে আসিয়াছিল তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। যেস্থানে এই তিনটি কার্য্য হয়; বৌদ্ধগণ সে তিনটি স্থানকেই পবিত্র পুণ্য তীর্থ বলিয়া মনে করিত এবং এই তিন স্থানেই বহুসংখ্যক স্তূপ বিহারাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। এবং এই তিনটী স্থানেরই ভগ্নাবশেষ কডোয়া নদী পার হইয়া ২ ক্রোশের মধ্যে অদ্যাপি লক্ষিত হয়। কারলীল সাহেব অনুমান করেন যে যে স্থানে ভগবান মস্তক মুণ্ডন করেন সেই স্থানে একটী প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষের উপর" শিরসারাও নামক একটি গ্রাম আছে। শিরসারাও শব্দের অর্থ মস্তক মুণ্ডন করা। যেস্থানে তিনি আপন বেশ প্রদান পূর্ব্বক একজন ব্যাধের নিকট তাহার বেশ ভিক্ষা করিয়া ধারণ করেন সেখানে নিরেট ইটের একটী প্রকাণ্ড স্তূপের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় আর যেস্থানে ভগবান্ ছন্দককে বিদায় দেন সে স্থানের নাম অদ্যাপি মহাস্থান বলিয়া বিখ্যাত। এই মহাস্থানে পরম সৌগত মহারাজা অশোক একটী প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন কালের ইট খুব বড় বড়। এখন মহাস্থানে খুব বড় বড় ইট অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

এই তিনটি স্তূপের সান্নিধ্য হইতে ভগবান্ হিয়াঙ্সাঙ পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে ১৮০লি অর্থাৎ ৩০ মাইল পথ, পর্য্যটন করিয়া নিবিড় ন্যগ্রোধবন মধ্যে মৌর্য্যরাজগণের রাজধানীতে উপস্থিত হন। বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার শরীরের দাহ করা হয়। দাহাবশিষ্ট অস্থি সকল আট-ভাগে বিভক্ত, যে আটজন রাজা দাহস্থলে

উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই সেই অস্থি সমূহ আটভাগে বিভক্ত করিয়া লন। এবং নিজ নিজ রাজধানীতে স্থাপন করিয়া তাহার উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াদেন। ভাগ শেষ হইয়া গেলে মৌর্য্যগণ তথায় উপস্থিত হন এবং ভগ্-বানের ধাতু প্রাপ্ত হইতে না পারায় একান্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে তাঁহার চুল্লীর অঙ্গারগুলি সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করেন এবং নিজ রাজধানীতে তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াদেন। হিয়াঙ্সাঙ এই স্থানে ঐ অঙ্গারস্তূপ দেখিতে পান।

গোরকপুর জিলার মধ্যে গড়ানদীর তীরে রাজধানী উপদোলিয়া নামক স্থানে বহুসংখ্যক প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইস্থান পূর্ব্বোক্ত মহাস্থান হইতে ২৯ মাইল এবং কড়োয়া হইতে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। এবং উহার নিকট অদ্যা-পি বহু সংখ্যক ন্যগ্রোধবৃক্ষ পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য কারলীল সাহেব এইস্থানকেই উক্ত মৌর্য্যরাজগণের রাজধানী বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং এই স্থানের একটি স্তূপকে অঙ্গার-স্তূপ বলিয়া মনে করেন।

ফাহিয়ান নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক এবং হিয়াঙ্সাঙ ঠিক এইস্থান হইতেই কুশীনগরে গমন করেন। কুশীনগর এই স্থান হইতে পূর্ব্বউত্তর পূর্ব্ব। কেবল বনের মধ্যদিয়া পথ। কিন্তু দুঃখের মধ্যে কুশীনগরে গিয়া বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রতিমা সন্দর্শন করিব এই আনন্দে ভোর হইয়া হিয়াঙ্সাঙ রাজধানী হইতে কুশীনগরের দূরত্ব লিখিয়া সাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এবং ফাহিয়ান যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে ও ভুল আছে। ফাহিয়ান বলেন যে রাজধানী হইতে কুশীনগর ১২ যোজন, ৮৪ মাইল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পরিণামে দৃষ্ট হইবে যে, উহা বার যোজন নহে বার ক্রোশ মাত্র ২৭। ২৮ মাইল। যদিও রাজধানী হইতে কুশীনগরের দূরত্ব স্থিরী-কৃত হইল না। কিন্তু হিয়াঙ্সাঙ বলিয়া গিয়াছেন যে কুশীনগর হইতে বারাণসী ৭০০ লি অর্থাৎ ১১৭ মাইল এবং ফাহি-য়ান বলিয়াছেন যে বৈশালী হইতে কুশী-নগর ২৫ যোজন বা ১৭৫ মাইল। এক্ষণে এই সমস্ত দূরত্ব লইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে গোরকপুর নামক স্থান হইতে ৩০ মাইল পূর্ব্বে কোন স্থানেই কুশীনগর নামক প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থটি অবস্থিত ছিল। গোরকপুর হইতে প্রায় ৩০ মাইল অন্তরে কসিয়া নামক একটী স্থানে একটী প্রাচীন নগরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। দেখিলে বোধ হয় একটী মাটীর ঢিপিমাত্র, কিন্তু খুঁড়িলে প্রচুর ইষ্টক প্রাপ্ত হওয়া যায়। কনিঙহাম সাহেব ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণ এই কসিয়াই কুশীনগরের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করিয়া-ছিলেন, এবং উক্ত মাহাত্মা সাহেব কসি-য়ার কয়েকটি স্থান খুঁড়িয়াও দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে কসিয়া কুশিয়ার অপভ্রংশ আর কুশিয়া কুশীনগরের অপ্র-ভ্রংশ। সুতরাং এই কসিয়াই সম্ভবতঃ কুশীনগর হইবে। উহার নিকটে কতক গুলি বৌদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়ায়

এই অনুমান অনেক পরিমাণে সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল। এইভাবে কিছুদিন যায় পরে ১৮৭৬ সালে কনিংহাম সাহেব আপনার সহকারী কারলীল সাহেবকে কসিয়ার স্থানে স্থানে খুঁড়িয়া উহা কুশীনগর কি না সপ্রমাণ করিবার আদেশ দেন; তদনুসারে উক্ত কারলীল সাহেব কসিয়া যাত্রা করিয়া ভগ্নাবশেষ মধ্যে বুদ্ধভিক্ষুর যে প্রতিমূর্ত্তি আছে তাহার সান্নিধ্যে শিবির সন্নিবেশ করেন।

কুশীনগরে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ স্তূপ ছিল, নির্ব্বাণ প্রতিমা ছিল, একটী প্রকাণ্ড বিহার ছিল এবং নির্ব্বাণ প্রতিমার জন্য একটী মন্দির ছিল। কারলীল সাহেব নিরতিশয় অধ্যবসায় বলে এই সকল গুলিই আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

তিনি যেস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন তাহার অবিদূরে মৃত্তিকারাশি অতি উচ্চ এবং তাহার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে একটা স্তম্ভের মত পদার্থ দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। এই উচ্চ ভূভাগ এবং ঐ স্তম্ভপ্রায় পদার্থ নিবিড় জঙ্গলে আবৃত, এতই জঙ্গল যে নিকটে যাওয়া যায় না। ইহাতে যাইতে হইলে জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হয়। দূর হইতে এই উন্নত ভূভাগ ও উহার উপরস্থিত, স্তম্ভ, শিখরাধ্যুষিত উচ্চ পর্ব্বতমালার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। কারলীল সাহেব মনে করিলেন এই স্থানে নিশ্চয়ই নির্ব্বাণ স্তূপের ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হইবেন এবং বহুসংখ্যক লোক আনাইয়া ঐ উন্নত ভূভাগের জঙ্গল পরিষ্কার করিলেন। তখন দৃষ্ট হইল যে যেস্থানটি সর্ব্বোচ্চ তাহার মস্তকে একটি নিরেট ইটের থাম প্রায় ২০ ফুট উচ্চ, তাহার পার্শ্বে ভূমি অনেকটা নিম্ন এবং এই নিম্ন ভূমির পার্শ্বেই আর একটি উচ্চ মৃত্তিকা রাশি। ইষ্টক স্তম্ভের ব্যাস প্রায় ২০ ফুট হইবে এবং পার্শ্ববর্ত্তী সমতল ভূভাগ হইতে উহার উচ্চতা ৫৭ ফুট। এই ৫৭ ফুট উচ্চ মৃত্তিকারাশির পশ্চিম নিম্নভূমি তাহার পার্শ্বে আবার উচ্চভূমি দেখিয়া শুনিয়া কারলীল সাহেব অনুমান করিলেন যে এই ৫৭ ফুট উচ্চ ইষ্টক রাশি নির্ব্বাণ স্তূপের ভগ্নাবশেষ। তাহার নিকটস্থ উচ্চ ভূভাগ নির্ব্বাণ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। আর চতুর্দ্দিগস্থ বিস্তৃত উচ্চভূমি নির্ব্বাণ বিহারের শেষ অবস্থা মাত্র।

এই মনে করিয়া তিনি সর্ব্ব প্রথমে নির্ব্বাণ মন্দিরের শিরোভাগ হইতে মৃত্তিকা খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মনে হইল নির্ব্বাণ প্রতিমা ইহারই মধ্যে অবস্থিত হইবে। সে প্রতিমা ত ছোট খাট নহে; ২০ ফুট দীর্ঘ এবং শয়ান অবস্থায় অবস্থাপিত মৃত্তিকাবাশির ঠিক শিরোভাগ হইতে যদি কূপের ন্যায় খনন করা যায়, নির্ব্বাণ প্রতিমা থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার কোন না কোন অংশ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই আশায় খনন কার্য্য আরম্ভ হইল। আশা অচিরাৎ ফলবতী হইল। ১০ ফুট খুঁড়িতে না খুঁড়িতেই কোদালিতে পাথর ঠেকিল। কারলীল সাহেব আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন চারিদিক খুঁড়িতে লাগিলেন কোন অংশ না ভাঙ্গিয়া যায় তজ্জন্য অত্যন্ত সতর্ক হইলেন ক্রমে তাঁহার মনের আশা পূর্ণ হইল। তাঁহার অধ্যবসায়ের ফল ফলিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুমান সফল হইল। বুদ্ধদেবের প্রস্তরপ্রতিমা উদ্ধার হইল। ভগবান্ যেমন মৃত্যু সময় দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিয়া ছিলেন তেমনি শয়ন করিয়া আছেন। পশ্চিমাস্যে ভগবান—নির্ব্বাণ লাভ করেন ভগবানের প্রতিমাও পশ্চিমাস্যে। অনুমান হইল হিয়াঙ্‌সাঙ প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে যে রক্তবর্ণ বালুকাপ্রস্তর প্রতিমা দেখিয়াছিলেন এও সেই প্রতিমা। কিন্তু হায় প্রতিমার পদদ্বয় নাই বামজানুর নিম্নভাগ নাই। বাম হস্ত নাই কোমরের কিয়দংশ নাই। মস্তক ও মুখের কিয়দংশও নাই। কারলীল সাহেব এই সকল ভগ্নাংশের জন্য অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন এবং সুখের বিষয় এই যে তাহার অনেক গুলি প্রাপ্তও হইলেন। অনেক অংশ সিংহাসনের মধ্যে গাঁথা হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ২০ ফুট দীর্ঘ সেই প্রতিমা উত্তোলন করতঃ তাহার নিম্নস্থ সিংহাসন ভগ্ন করতঃ প্রতিমার যে সকল অংশ তাহার মধ্যে গাঁথা ছিল তাহা সংগ্রহ করিতে হইল। সিংহাসনটির দৈর্ঘ্য ২৩ ফুটও প্রস্থ ৫ ফুট ৬ ইং। যতদূর সম্ভব প্রতিমার ভগ্নাংশসমূহ সংগৃহীত হইলে কারলীল সাহেব সিংহাসন ও প্রতিমার সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

ক্রমশঃ

জৈনধর্ম্ম।

জৈনধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে বংশানুক্রমে বদ্ধমূল এইরূপ সংস্কার আছে যে তাঁহাদের ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন। তাঁহাদের গুরুদেব ভগবান্ নির্গ্রন্থনাথ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। তাঁহার বর্দ্ধমান, মহাবীর প্রভৃতি অন্যান্য অনেক গুলি নাম আছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, কতিপয় পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন আচারাঙ্গসূত্র, কল্পসূত্র প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ জৈনধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতেছে, সেগুলি অবিশ্বাস্য। তাঁহাদের মধ্যে দুই একজনের বিশ্বাস যে খৃষ্টের দশম শতাব্দির প্রারম্ভে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম অস্তমিতপ্রায়, সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই জৈনসম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং জৈনসম্প্রদায় বৌদ্ধগণের বহুকালপরবর্ত্তী ও

জৈনধর্ম্ম শাক্যমুনি সংস্থাপিত ধর্ম্মের অবান্তর-ভেদ মাত্র। ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক লেথব্রিজসাহেব উক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের একজন প্রধান ছাত্র। তিনি স্বপ্রণীত ইংরাজী ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থে সুকুমারমতি বালকবৃন্দকে ভ্রান্তমতের অনুসরণ করাইবার জন্য অম্লানবদনে লিখিয়া গিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিসময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া জৈনধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছে। লেথব্রিজ সাহেবের ন্যায় আমাদের দেশের ও অনেক শিক্ষিতলোক উক্ত মতের পোষকতা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ডাক্তার হোরন্‌লি, জাকোবি, বুলর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উক্ত মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহারা প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত জৈন উপাসকগণের ইতিহাস বিশ্বাস করেন। ঐ সকল ইতিহাস কিজন্য যে বিশ্বাস করেন সে বিষয়ে তাঁহারা অখণ্ডনীয় যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে জৈন পুস্তকে লিখিত ভগবান নির্গ্রন্থনাথের জীবনীর সহিত বুদ্ধদেবের জীবনীর তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারাযায়, যে জৈনসম্প্রদায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক জৈন গুরু নির্গ্রন্থনাথ মহাবীরের জীবনীর সহিত শাক্যমুনির যে সাধারণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কারণ এই, তাঁহারা উভয়েই সন্ন্যাসধর্ম্মে ব্রতী হইয়া ছিলেনএবং তাঁহারা উভয়েই সমসাময়িক, স্বজাতি ও ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন। মহাবীরের কুটুম্ব গণের সহিত বৌদ্ধদেবের কতক গুলি জ্ঞাতির নামের ও মিল আছে বটে। মহাবীরের স্ত্রীর নাম যশোদা, বৌদ্ধদেবের স্ত্রীর নাম যশোধরা; মহাবীরের জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম নন্দিবর্দ্ধন, বৌদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম নন্দ; বুদ্ধদেব সিদ্ধার্থ নামে অভিহিত হইতেন, মহাবীরের পিতার নাম ও সিদ্ধার্থ ছিল। কিন্তু এই কয়েকটী নাম উভয়েরই বংশমধ্যে আছে বলিয়া কি জৈন সম্প্রদায় বৌদ্ধ হইতে উৎপন্ন বলিতে পারা যায়? ফলতঃ ইহার দ্বারা কেবল এই প্রমাণ হয়, যে তৎকালে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে ঐ সকল নামের ব্যবহার অধিক ছিল।

সিদ্ধার্থের জীবনের ঘটনাবলির সহিত জিনদেবের জীবনীর তুলনা করিলে অনেক গুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব কপিলবাস্তু নগরে জন্ম গ্রহণ করেন; বৈশালীর নিকটবর্ত্তী একটি পল্লীতে ভগবান্ মহাবীরের আবির্ভাব হয়। বুদ্ধদেবের জননী তাঁহাকে প্রসব করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন; মহাবীরের জনক জননী তাঁহার যৌবন অবস্থা পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। বুদ্ধদেব স্বীয় পিতা শুদ্ধোদনের অজস্র অনুনয় বিনয় অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই সন্ন্যাসধর্ম্মে ব্রতী হন; ভগবান্ নির্গ্রন্থনাথ স্বীয় পিতৃবিয়োগ হইলে আত্মীয় স্বজনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রমে দীক্ষিত হন। বুদ্ধদেব ছয় বৎসর কাল সন্ন্যাস আশ্রমে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; জিনদেব বর্দ্ধমান দ্বাদশ বর্ষ ক্লেশ-বহুল তাপসধর্ম্মে অবস্থান

করেন। বুদ্ধদেব ভাবিয়াছিলেন তাঁহার ঐ ছয় বৎসর কাল বৃথা নষ্ট হইয়াছে, তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে তপঃক্লেশ কিছুই সহায়তা করিতে পারেনাই। মহাবীর সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন নির্ব্বাণ লাভের পক্ষে তপস্যাই প্রধান উপায়। দ্বাদশবর্ষ তপস্যাক্লেশ ব্যতিরেকে কোন সন্ন্যাসীই নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন না। গোশালমাঙ্খলিপুত্র জৈনগুরু মহাবীরের বিরোধিগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন, কিন্তু তিনি জৈন দিগের যাদৃশ বিরোধী ছিলেন বৌদ্ধদিগের তাদৃশ বিরোধী ছিলেন না। জামলির সময় প্রথমে জৈনদিগের মধ্যে সম্প্রদায়-ভেদ প্রবর্ত্তিত হয়; কিন্তু বুদ্ধদেবের ইতিহাসমধ্যে তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেব কুশীনগরে নির্ব্বাণ লাভ করেন, কিন্তু নির্গ্রন্থনাথ তাঁহার মৃত্যুর অনেক পূর্ব্বে পাপা নগরীতে স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন।

অনেকে জৈনগণের সহিত বৌদ্ধগণের কতকগুলি ধর্ম্মগতসামঞ্জস্য দেখাইয়া বলিয়া থাকেন, যে নিশ্চয়ই বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এবিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

উভয় সম্প্রদায়ই তাহাদের গুরুগণের জিন, অর্হৎ, মহাবীর, সুগত, তথাগত, সিদ্ধ, বুদ্ধ, সম্বুদ্ধ, পরিনিবৃত্ত, মুক্ত প্রভৃতি উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল উপাধি সম্বন্ধেও সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধ, তথাগত, সুগত এবং সম্বুদ্ধ এই কয়েকটী উপাধিতে শাক্যমুনিকেই ভূষিত দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবীরের এ কয়টী উপাধি অতি বিরল-প্রচার। জিনগুরু বর্দ্ধমানের বীর ও মহাবীর এই দুই উপাধি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। জৈন গুরুগণ তীর্থঙ্কর এই উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়া থাকেন, কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রে তীর্থঙ্কর এই অর্থে বিধর্ম্মীগণের উপাধি বুঝায়। এই সকল দেখিয়া স্পষ্ট অনুমান হয়, যে জৈনগণ বৌদ্ধগণের নিকট হইতে এ সকল উপাধি গ্রহণ করেন নাই। যখন বৌদ্ধগণ এই সকল উপাধি গ্রহণ করিয়াছিল তখন নিশ্চয়ই তাহারা জৈনগণের বিরোধি ছিল। সুতরাং ইহাতে বরং জৈনসম্প্রদায়ের প্রাচীনত্বই প্রমাণ হইতেছে। আর যখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্ম প্রায় এক সময়েরই, তখন যে উভয় সম্প্রদায় মধ্যে সম্মান সূচক কতকগুলি একরূপ উপাধি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। সমস্ত উপাধিগুলি যদ্যপি উভয় ধর্ম্মেই এক অর্থে ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে বরং সন্দেহের কারণ থাকিত। কিন্তু জৈনধর্ম্মে যে শব্দ এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্মে সেই শব্দ অন্য কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বুদ্ধ শব্দ জৈনশাস্ত্রে সাধারণ ধাত্বর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে উহা শাক্যমুনির প্রধান উপাধি।

কেহ কেহ বুদ্ধভিক্ষুগণের দশ শীলের সহিত জৈনগণের পঞ্চ মহাব্রতের তুলনা করিয়া জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের দশশীল :—

১—প্রাণাতিপাত করিব না।
২—অদত্তপদার্থ গ্রহণ করিব না।
৩—কামকার্য্যে মিথ্যাচার হইতে বিরত থাকিব।
৪—মিথ্যা বলিব না।
৫—মদ্যপান করিব না।
৬—দ্বিকাল ভোজন করিব না।
৭—নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয় হইতে বিরত থাকিব।
৮—মালা, চন্দন ও অলঙ্কার ব্যবহার করিব না।
৯—উচ্চ অথবা প্রশস্ত শয্যায় শয়ন করিব না।
১০—স্বর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করিব না।

যে সকল বৌদ্ধেরা ভিক্ষু নহেন তাঁহাদের জন্য নিম্নলিখিত অষ্টাঙ্গ শীলের বিধান আছে। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটী সকলকেই পালন করিতে হইবে। আর শেষ তিনটী ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিগণ পালন করিবেন :—

১—প্রাণাতিপাত করা উচিত নহে।
২—অদত্ত বস্তু গ্রহণ করা উচিত নহে।
৩—মিথ্যা বলা উচিত নহে।
৪—মদ্যপান করা উচিত নহে।
৫—ব্যভিচার করা উচিত নহে।
৬—রাত্রিতে গুরুপাক বস্তু ভোজন করা উচিত নহে।
৭—গন্ধ দ্রব্য বা মালা ব্যবহার করা উচিত নহে।
৮—ভূমিতে মাদুর পাড়িয়া নিদ্রা যাওয়া উচিত।

জৈন ভিক্ষুগণের পঞ্চ মহাব্রত।

১—অহিংসা।
২—সূনৃত।
৩—অস্তেয়।
৪—ব্রহ্মচর্য্য।
৫—অপরিগ্রহ।

বৌদ্ধগণের উপরোক্ত প্রথম পাঁচটী শীলের সহিত জৈনভিক্ষুগণের পঞ্চ মহাব্রতের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এগুলি প্রায় সমান। প্রথম নিয়ম চারিটী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একরূপ ক্রম অনুসারে নাই বটে, কিন্তু ক্রমভঙ্গ করিয়া মিলাইয়া লইলেই ঠিক মিলিয়া যায়। আর জৈনগণের পঞ্চম মহাব্রত "অপরিগ্রহ" বুদ্ধগণের পঞ্চম শীলের অপেক্ষা সাধারণ অর্থপ্রকাশকরে মাত্র বৌদ্ধগণের ৫ম নিয়মটী উহার অন্তর্ভূত। এই সকল সামঞ্জস্য দেখিয়া এরূপ সন্দেহ হওয়া সম্ভব যে সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে একটী নিশ্চয়ই অন্যতরের নিকট হইতে নিয়মগুলি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কারণ উহা তাহাদের কাহারও নিজের সম্পত্তি নয়। আমরা দেখাইব উভয়েই ব্রাহ্মণসন্ন্যাসীগণের নিকট এগুলি গ্রহণ করিয়াছে।

ক্রমশঃ

সনাতন ধর্ম্ম।

প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ।

আর্য্য জাতির মধ্যে একটা জনশ্রুতি আছে যে, যৎকালে রাক্ষসরাজ দশানন জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে ত্রেতাযুগের অধিকার বিস্তার হইয়াছিল, সত্যযুগের নির্দ্দিষ্ট সময় সম্পূর্ণ ভোগ হইল না। সত্যযুগ ব্রহ্মার নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন, ব্রহ্মন্! আপনকার বরপ্রভাবে দুর্দ্দান্ত রাক্ষসরাজ দশাননের দৌরাত্ম্যে আমি অসময়ে অধিকারচ্যুত হইয়াছি; আমার উপায় কি হইবে! ব্রহ্মা কহিলেন, যদিও তুমি এক্ষণে অসময়ে অধিকারচ্যুত হইয়াছ, তথাপি প্রত্যেক যুগের মধ্যে কিছু কাল করিয়া তোমার অধিকার নির্দ্দিষ্ট করিয়াদিলাম। ত্রেতা যুগের শেষে যখন রামচন্দ্র রাবণ বধ করিবেন, সেই সময় তোমার পঞ্চদশ সহস্র বৎসর এবং দ্বাপরযুগে তোমার দশ সহস্র বৎসর ও কলিযুগে তোমার পঞ্চ সহস্র বৎসর অধিকার ভোগ হইবে। ব্রহ্মার আদেশ ক্রমে কলিযুগের পঞ্চ সহস্র বৎসর নিজ অধিকার ভোগের পর সত্য যুগের পঞ্চ সহস্র বৎসর অধিকার ভোগের সম্ভাবনা। এক্ষণে কলির নিজ অধিকারভোগ—৪৯৮৮ বৎসর হইয়াছে। জনশ্রুতি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আর ১২ বৎসর পরে সত্যযুগের অধিকার বিস্তার হইবে। পরন্তু ইহাও সহজে অনুমিত হইতেছে যে, সত্যযুগের এই ভোগকাল পঞ্চ সহস্র বৎসরের মধ্যে বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য অথবা প্রাতঃসন্ধ্যা মধ্যাহ্ন ও শেষ সন্ধ্যা আছে।

ইতি পূর্ব্বে কলিযুগের প্রভাবে সনাতন ধর্ম্ম তিরোহিতপ্রায় হইয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যযুগের আগমনের সময় উপস্থিত দেখিয়া তিনি পুনর্ব্বার আর্য্যভূমিতে অবতীর্ণ হইতেছেন। অধুনা সর্ব্বজীবের সমষ্টিরূপ বিরাট্ পুরুষের ইচ্ছা হইয়াছে যে, সনাতন ধর্ম্ম পুনর্ব্বার সকলের নিকট পরিচিত ও সমাদৃত হয়েন। এক্ষণে বিরাট্ পুরুষের ইচ্ছানুসারে অনেকেই পরিচালিত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকাশে ও জয়ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদিগের ইচ্ছা যখন বিরাট্ পুরুষের ইচ্ছার একাংশ, তখন আমরাও তদ্দ্বারা পরিচালিত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের স্বরূপ নিরূপণে ও মাহাত্ম্য প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাই এতৎপ্রকাশের প্রয়োজন।

এক্ষণে এই গ্রন্থে যাহা যাহা অভিধেয়, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। যথা প্রমাণনিরূপণ। ধর্ম্মের স্বরূপ নিরূপণ। প্রণবের স্বরূপ। প্রণব হইতে জগতের সৃষ্টি। শব্দ সৃষ্টি ও অর্থ সৃষ্টি। হিরণ্যগর্ভ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বিরাট্ মূর্ত্তি। শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম নিরূপণ। ন্যায় সাঙ্খ্য বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন কারদিগের স্ব স্ব মতের

সত্যতা ও পরস্পর বিরোধভঞ্জন। সকলের উপাস্য দেবতা নিরূপণ। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপাসকদিগের স্ব স্ব মতের সত্যতা ও পরস্পর বিরোধ ভঞ্জন। তন্ত্রশাস্ত্র, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশাস্ত্রের ও সকল সম্প্রদায়ের উপজীব্য। তন্ত্রশাস্ত্রের নিত্যতা। তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্গত গ্রন্থবিশেষের বিলয় ও গ্রন্থবিশেষের নূতন আবির্ভাব। তন্ত্রশাস্ত্রের কোন্ অংশ হইতে কোন্ দর্শন শাস্ত্রের আবির্ভাব। ব্রহ্মা হইতে শিবের উৎপত্তি, বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি এবং শিব হইতে বিষ্ণুর উৎপত্তি এতৎসম্বন্ধীয় মতের সত্যতা ও বিরোধ ভঞ্জন। সৃষ্টি পদার্থমাত্রেই উপাদান-কারণ প্রণবের সপ্ত অঙ্গের চিহ্ন। প্রণবের সপ্ত অঙ্গ হইতে সপ্ত আম্নায়ের আবির্ভাব। সপ্ত আম্নায় হইতে সপ্তমঠ। পূর্ব্ব আম্নায়ের দেবতা মন্ত্র ধ্যান স্তব ও আচারাদি নিরূপণ। দক্ষিণ আম্নায়ের দেবতা মন্ত্র ধ্যান স্তব ও আচারাদি নিরূপণ। পশ্চিম আম্নায়ের দেবতা মন্ত্র ধ্যান স্তব ও আচারাদি নিরূপণ। উত্তরাম্নায়ের দেবতা মন্ত্র ধ্যান স্তব ও আচারাদি নিরূপণ। ঊর্দ্ধাম্নায়ের দেবতা মন্ত্র ধ্যান স্তব ও আচরাদি নিরূপণ। অধ আম্নায়ের দেবতা মন্ত্র ধ্যান স্তব ও আচারাদি নিরূপণ। সপ্তমাম্নায়ের গূঢ়তা। পূর্ব্বাম্নায়ে কথিত হঠযোগ ও তৎসাধন প্রণালী। দক্ষিণস্রোতেকথিত লয়যোগ ও তৎসাধন-প্রণালী। পশ্চিমাম্নায়ে কথিত লক্ষ্য যোগ ও তৎসাধন-প্রণালী। উত্তরাম্নায়ে কথিত রাজযোগ ও তৎসাধন-প্রণালী। ঊর্দ্ধাম্নায়ে কথিত সন্ন্যাস উন্মনীযোগ ও তৎ-সাধন প্রণালী। অধ আম্নায়ে কথিত গুরুতত্ত্ব অমনস্ক যোগ ও সহজযোগ। সপ্তমাম্নায়ে কথিত বিদেহমুক্তি।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ। যুগভেদে ধর্ম্মভেদের কারণ। মহর্ষিদিগের বিভূতি। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য। সাকার উপাসনা ও স্থূল ধ্যান। নিরাকার উপাসনা ও সূক্ষ্ম ধ্যান। অধিকারিভেদে উপাসনার আবশ্যকতা। অধিকারিভেদে উপাসনার অনাবশ্যকতা। জীবন্মুক্তের লক্ষণ। সিদ্ধির লক্ষণ। উত্তম মধ্যম ও সামান্য সাধকের লক্ষণ। গুরুর লক্ষণ। শিষ্যের লক্ষণ। গুরু বাক্যে দৃঢ়তা ও গুরুভক্তির ফল। কোন্ আম্নায়ের কোন্ অংশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম খৃষ্টানধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছে। আর্য্য ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা প্রতিপাদন। গুরু বিষয় প্রকাশ নিবন্ধন ভগবতীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা। এই সমুদায় বিষয় এবং ইহার আনুষঙ্গিক অন্য যাহা আবশ্যক হয়, তাহা এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইবে; পরন্তু সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার অনুরোধে যাহার পর যে বিষয় আবশ্যক বোধ হইবে, তাহাই লিখিত হইবে।

এক্ষণে প্রয়োজন ও অভিধেয় বলা হইল, পরন্তু ধর্ম্মের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ কি, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। ধর্ম্মই সমাজ রক্ষা করিতেছেন ও জগৎ রক্ষা করিতেছেন, ধর্ম্ম আমাদের নিত্য সহচর বন্ধু। আত্মা পরলোক গমন করিলেও ধর্ম্ম সহগামী হইয়া থাকেন। মনুষ্যের পক্ষে ধর্ম্মের ন্যায় অমূল্য ধন আর কিছুই নাই।

ধর্ম্মই মনুষ্যকে ক্রমশ উন্নত সোপানে উত্থাপিত করেন। ধর্ম্ম বলে মানব, মানব-দেহধারী হইয়াও দেবতার ন্যায় বিভূতি প্রাপ্ত হয়েন। অতএব ঈদৃশ অসাধারণ বন্ধু ধর্ম্মের সমগ্র অবয়ব পরিজ্ঞাত হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

প্রমাণ নিরূপণ।

সনাতন ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হইলে কোন্ প্রমাণ অবলম্বন করিব তাহা অগ্রে ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। কথিত আছে;—

"প্রত্যক্ষমেককার্ব্বাকাঃ কণাদস্তুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চতচ্চাপি সাঙ্খ্যাঃ শব্দঞ্চ তে অপি॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রাভাকরা॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভট্টাবেদান্তি নস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥"

চার্ব্বাকেরা, একমাত্র প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রামাণই স্বীকার করেন না। কণাদ ও সৌগতগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী মাত্র প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সাঙ্খ্য মতাবলম্বীরা প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিনটী মাত্র মাণ স্বীকার করেন। কোন কোন নৈয়ায়িক সাঙ্খ্য মতেই মত দেন। কোন কোন নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ এই চারিটী প্রমাণ স্বীকার করেন। প্রভাকর-মতাবলম্বীরা প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ ও অর্থাপত্তি এই পাঁচটী প্রমাণ মান্য করিয়া থাকেন। ভট্টমতালম্বী ও বেদান্তসভাবলম্বীরা প্রত্যক্ষ অনুমানউপমান শব্দ অর্থাপত্তি ও অভাব, এই ছয়টী প্রমাণ স্বীকার করেন। পৌরাণিকগণ প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ অর্থাপত্তি সম্ভব ও ঐতিহ্য, এই আটটী প্রমাণ স্বীকার করেন। আমরা তন্ত্র অনুসারে এই আটপ্রকার প্রমাণই স্বীকার করিয়া থাকি, পরন্তু যিনি যে প্রমাণ স্বীকার করেন, তাঁহাকে সেই প্রমাণ দ্বারাই ধর্ম্মের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে আমরা সবিশেষ যত্নবান্ হইব। যাঁহারা প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছুই মানেন না, তাঁহাদের নিকট সনাতন ধর্ম্ম উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবে না।

শম্ভু বলিয়াছেন; "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥" কেবল শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্ম নিরূপণ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ যুক্তিহীন বিচার দ্বারা ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে। অতএব আমরা শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্ম নির্ণয় করিব, পরন্তু যুক্তিকে সমাদরের সহিত সর্ব্বদাই সম্মুখে রাখিব। কোন ক্রমেই যুক্তির অবমাননা করিব না। ক্রমশঃ—

শৃঙ্খলা।

"শৃঙ্খলা" শব্দের অর্থ কি—একথা স্পষ্ট করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না; এজন্য স্বতন্ত্র সংজ্ঞার অবতারণা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তবে এই পর্য্যন্ত

বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যিনি কখনও কোন কার্য্য করিয়াছেন অথবা যিনি কখনও কোন দ্রব্য সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনিই এ বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন। কার্য্য-ঘটিত অভিজ্ঞতা সকলের না থাকিতে পারে (যদিও ইহা নিতান্ত অসম্ভব) কিন্তু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কখনও কোন দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হয় নাই, অন্ধ ব্যতীত এ কথা আর কেহই বলিতে পারেন না, সুতরাং এত স্বভাবসিদ্ধ বিষয় বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র বরং এবিষয়ে দুই একটি উদাহরণ দেওয়াই প্রশস্ত। মনে করুন আমাকে ১০০/০ চাউল পল্লিগ্রাম হইতে কলিকাতায় আনয়ন করিতে হইবেক। এখন কে কোন্ দিন কত চাউল সরবরাহ করিতে পারিবে, তাহাই স্থিরকরা প্রথমতঃ আমার কর্ত্তব্য। পরে সমস্ত চাউল সংগৃহীত হইলে উপযুক্ত লোক এবং গাড়ি বা লোকের দ্বারা চালান দেওয়া বিধেয়।

এই সমস্ত কার্য্য উপযুক্ত রূপে উপযুক্ত সময়েও উপযুক্ত উপায়ে নিষ্পন্ন করার নামই শৃঙ্খলা। ইহার কোন একটির কোন রূপ ব্যত্যয় হওয়ার নামই বিশৃঙ্খলা। যেমন চাউল সংগ্রহের দিন দেখিয়া লইবার লোক না রাখা কিম্বা পৌছাইয়া দিবার স্থান নিরূপণ না করিয়া দেওয়া ইত্যাদি বিশৃঙ্খল কার্য্য। কার্য্য সম্বন্ধেই যে কেবল শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলা এই দুই শব্দ ব্যবহার করা যায় এরূপ নহে; দ্রব্যাদিও বিশৃঙ্খল হইতে পারে। যেমন, যে ঝড়ীর বায়ুসঞ্চালনের পথ অতি সঙ্কীর্ণ সেটিকে বিশৃঙ্খল বলা যাইতে পারে।

আমাদের দেশে চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা। ইহার এক একটি করিয়া দেখাইয়া দেওয়া এবং যথাসাধ্য নিবারণের উপায় স্থির করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্যবসাকার্য্যে কলিকাতার প্রধান বিশৃঙ্খল গরুর গাড়ী। যিনি ঠেকিয়াছেন তিনিই জানেন যে ইহা অপেক্ষা গোলোযোগের কারণ আর আছে কি না। কোন গুদামে মাল লইবার জন্য ২০। ৩০ খানি গাড়ী একত্র হয়। গাড়োয়ানেরা অত্যন্ত বেগোচ করিয়া গাড়ী রাখে এবং সকলেই একেবারে বোঝাই করিতে আরম্ভ করে। পশ্চাতের গাড়ী মালের অধিক নিকট বলিয়া অগ্রে বোঝাই হয় কিন্তু বাহির হইতে না পারিয়া মহা গোলোযোগ করে। শৃঙ্খলানিপুণ ব্যক্তি মাত্রেই এই বিষয়টি দেখিলেই বলিতে পারিবেন যে, সময় ও পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্য প্রথমতঃ গাড়িগুলি স্থান অনুসারে দুই তিন কিংবা চারি সারিতে রাখা উচিত। গরুগুলিও এমন ভাবে সাজান উচিত যে কোন্ গাড়ীর কোন্ গরু, তাহা শীঘ্র অজ্ঞ-লোকের দ্বারাও বাছিয়া লওয়া যায়। পরে ৪। ৫ জন গাড়োয়ান গরুর তত্ত্বাবধারণ করিবে, ১০ জন একত্র হইয়া প্রথম ২। ৩ বা ৪ খানি গাড়ী বোঝাই করিবে ও ৪। ৫ জন বোঝাই হইবা মাত্র গরু জুতিতে থাকিবে। প্রথম গাড়ীগুলি বোঝাই হইলেই তাহারা চলিয়া যাইবে। এবং অবশিষ্ট লোক পুনঃ বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিবে। গরুর গাড়ী সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা আছে। এই গাড়ী সকল সার বন্দী হইয়া যাইবার সময় প্রত্যেক দুই খানির পর এক খানি গাড়ী

সচ্ছন্দে যাইবার ফাঁক থাকা অত্যন্ত আবশ্যক কিন্তু তাহা না করিয়া ইহারা এক সারে ১০। ১২। ১৫ খান থাকিয়া মহা বিশৃঙ্খল উপস্থিত করে। এই গেল চালানসম্বন্ধে। নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে এই কত্তব্য যে চক্রের মধ্য ঘর্ষণ স্থান লৌহ দ্বারা বাঁধান উচিত তাহা হইলে গাড়ীগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী ও ক্ষিপ্রগামী হইবে। ফলতঃ লৌহ দ্বারা বাঁধাইতে যে খরচ পড়িবে অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ উপকার দর্শিবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা প্রথমে গরুর গাড়ি লইলাম তাহার কারণ এই বিষয়টি সহজে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। সহজ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সাবধানে ক্রমে ক্রমে কঠিন বিষয় লইয়া সাধারণের বোধগম্য করা তাদৃশ কঠিন নহে। এক্ষণে ট্রামগাড়ি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। ট্রাম আমাদের কয়েকটি অনিষ্ট করিয়াছে এবং তন্মধ্যে ২। ১ টি কেবল শৃঙ্খলার অভাবেই জন্মিয়াছে।

প্রথমতঃ এই গাড়ী গুলির মৃদুগতি আমাদিগকে অভ্যস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা আর ইহার মৃদু গতিতে বিরক্ত হই না। দ্বিতীয়তঃ দুইখানি গাড়ীর মধ্যে কাল ব্যবধান অতি বিস্তর। ইহাতে ও পূর্ব্বোক্ত কারণে আমরা সময়ের মূল্য একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। একজন লোক ২৫ মিনিট অপেক্ষা করিয়া ৩০ মিনিটে হাঁটিবার পথ যাইবেন তথাচ চলিতে পারিবেন না। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে কেহ কেহ গরাণহাটা হইতে হেদো যাইবার জন্য ট্রামে উঠিয়া অন্যূন দেড় ঘন্টা কাল ব্যায় করেন। ট্রামের ১ম দুই কর্ত্তব্য শীঘ্র শীঘ্র গাড়ী ছাড়া ও দ্রুত গতি চালান। ট্রামকোম্পানী মনে করিতে পারেন যে তাড়াতাড়ি গাড়ী ছাড়িলে তাঁহাদের লাভ কমিয়া যাইবে। কিন্তু এটি নিতান্ত ভুল। জনসাধারণের আবশ্যক বুঝিয়া তদ্রূপ কার্য্য করিলে ব্যবসায়ীর কস্মিন্ কালে লোকসান হয় না। প্রত্যুত এই প্রধান নিয়ম বুঝিতে না পারাই বাণিজ্য নাশের অনেক সময় প্রধান কারণ। ব্যবসায়ী মাত্রেরই কেবল দেখা চাই যে লোকে কি চায়। লোকের অভাব কিসে দূর হয়। এই বিষয়টি সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া, সাবধান হইয়া চলিলে সকল ব্যবসাই সুচারুরূপে চলে। ট্রামকোম্পানী যে জনসাধারণের অভাব সময়ে সময়ে দেখেন না এবং তজ্জন্য যে তাঁহাদেরই ক্ষতি হয় তাহার একটি উদাহরণ এই। ষ্ট্রাণ্ডরোডের গাড়ীগুলি চিতপুর হইতে হাটখোলায় বেলা ৮। ৯ টা পর্য্যন্ত ক্রমাগতই যাইতেথাকে ও বৈকালে ৩। ৪ টা হইতে ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই সকল গাড়ীতে লোক লওয়া হয় না। কেহ তাহাতে উঠিলে তাঁহাকে নামাইয়া দেওয়া হয়। এক্ষণে ব্যক্তব্য খালি গাড়ী যাওয়া এবং লোকপূর্ণ গাড়ী যাওয়ার খরচ একই। কিন্তু লোকপূর্ণ গাড়ীর আয় আছে, খালি গাড়ীর নাই। লোক পাইবার বিষয় কোন সন্দেহ হইতে পারে না। যে কে[illegible] অনেক লোক কেবল চিৎপুর হইতে [illegible] হাটা যান এবং নিমতলা ও হাবড়[illegible] য়ের যাত্রিগণ ট্রামের অভাবে [illegible] বোধ করেন। আমাদের [illegible] কালে শিল্প দ্রব্যের উন্নতি হ[illegible]

বশতঃ আমরা ট্রাম-নির্ম্মাণের উত্তরোত্তর অবনতি দেখিতেছি। নূতন গাড়ীগুলি পুরাতন অপেক্ষা বিস্তর ভারী। তাহাদের বায়ু-সঞ্চালন-পথ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ও বৃষ্টির সময় আরোহীদিগের অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে।

প্রায় ২৫ বৎসর হইল ভারতে কলের গাড়ী চলিতেছে। এখনও এক একটি এমন বিশৃঙ্খল আছে যে তাহা বলিবার নয়। প্রথমতঃ দেশীয় সদ্বংশজাত নারীগণের বিশ্রামের কোন স্থান নাই। আমাদের দেশ অতি দরিদ্র। এখানে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা আয় হইলেই একজন লোক মধ্যবিত হইবেন। সুতরাং অসাধ্য ব্যয় স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবার লইয়া যাওয়া অনেকের অদৃষ্টে ঘটে না।

ক্রমশঃ—

শৈলজা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বউ বউ।

সুরী, নীরীকে বলিল "আয় ভাই আজ বউ বউ খেলি"; নীরী বলিল; "সকাল বেলা বউ বউ খেলিব না—পুতুল খেলিবে ত এস দুই জনে খেলি"। সুরীর মনে ধরিল না নীরী বুঝিতে পারিল;—নীরী আপন মনে খেলাঘরের হাঁড়ি কুঁড়ি সাজাইতে াগিল। সুরী বলিল তবে আমি বাড়ী ...। নীরী খেল্‌না ফেলিয়া উঠিয়া ...া সুরীর হাত ধরিয়া বলিল "বর ... ভাই?—কনে হইবে কে ভাই"? ...রী প্যাচে পড়িয়া গেল ভাবিতে ...শকে ও ভবেনকে তাহাদিগের বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিবে কি না এমন সময় যোগেশ ও ভবেন তাহাদিগের বাড়ীর আপন আপন ঝির সহিত আসিয়া নীরবালাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল—সুরী আহ্লাদে চিৎকার করিয়া উঠিল, নীরী তাহা করিল না, নীরী সুরীকে বলিল "কনে হইবে কে?" সুরী ভাবিল নীরী পোড়ার মুখী বড় দুষ্ট, খেলিবার ইচ্ছা নাই বলিয়া কতই অছিলা করিতেছে। শেষ বলিল "আমি বোসেদের শৈলী পোড়ার মুখীকে আনিগে। তুই যাবি ত আমার সঙ্গে আয়।" নীরী, যোগেশ ও ভবেনকে "আমরা এখনি আসিতেছি—আসিয়া বউ বউ খেলিব, তোমরা ব'স বাড়ী চলিয়া যাইও না" বলিয়া সুরীর সহিত ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। সুরী হন্ হন্ করিয়া বোসেদের ঘরে যেখানে শৈলজার মা, শৈলজাকে খাবার দিতেছিলেন, সেই স্থানে একেবারে উপস্থিত হইয়া শৈলজাকে বলিল। "শৈলি! এখনো তোর খাওয়া হয় নি? বর যে আসিয়া নীরীদের বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—শীগ্‌গির আয় শীগ্‌গির আয়।"

শৈলজা আর খাবার খাইল না। মার নিকট পরিবার কাপড় চাহিল। নীরবালা, সুরবালাকে বলিল—"ও কি ভাই! দেখ দেখি শৈলজা তোমার জন্য খাবার খাইল না।" সুরবালা বলিল—"তা আমি কি ওকে খাবার খাইতে বারণ করিয়াছি? "তুই যেমন ন্যাকা মেয়ে—না শৈলী তুই খাবার খাইয়া নে, আমরা দাঁড়াইয়া আছি।" শৈলজা বলিল "আমি খাবাল খাব না, বল্ চলে যাবে, মা আমায় কাপল দাও না?—আমি খাবাল খাব না"। শৈলজার মা এক খানি পাঁচ হাত কাপড় শৈলজাকে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, খাবার না খাইলে বর বে করিবে না। তখন শৈলজা দুই এক গাল তাড়াতাড়ি জলপান খাইয়া আমার খাওয়া হইয়াছে বলিয়া সুরবালা ও নীরবালার হাত ধরিল। তাহারা, তাহাকে লইয়া চলিয়া আসিল।

শৈলজা নীরবালাদের বাড়ীতে যাইবামাত্র যোগেশ ও ভবেন দুই জনেই আহ্লাদে তাহার নিকট আসিল। শৈলজা, নীরবালা ও সুরবালার হাত ছাড়িয়া দিয়া যোগেশ ও ভবনের হাত ধরিল। সুরবালা ছয় বৎসরের বালক দুটিকে ও তিন বৎসরের বালিকাটিকে এক মনে দেখিতে ছিল।—তিনটিতে মিলিয়া আহা কেমন হইয়াছে, তাহাই ভাবিতে ছিল; খেলিবার কথা আর তাহার মনে ছিল না; নীরবালা মনে করিয়া দিল। নীরবালা বলিল "সুরি! বর কে হবে? সুরবালা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া শৈলজাকে জিজ্ঞাসা করিল-"শৈলি! তুই কাকে বে কর্ব্বি—যোগেশকে না ভবেনকে!" শৈলজা বলিল "যোগেচকে।" যোগেশের মুখে হাসি আসিল, ভবেনের মুখ শুখাইয়া গেল;—শৈলজা যোগেশের হাত ছাড়িয়া দিয়া ভবেনের দুইটি হাত ধরিল। ভবেনের মুখে আবার হাসি আসিল। সুরবালা, শৈলজাকে হাসিয়া বলিল—"দূর্ হতোপ, ছাড়ি! অমন সুন্দর টুক্‌টুকে বরকে বে না করিয়া কাল বরকে পছন্দ হলো।" এই বলিয়া নীরবালার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল—নীরবালাও একটু মুচকিয়া হাসিল। সে হাসির অর্থ তাহারাই বুঝিল, আর কেহ বুঝিতে পারিল না।

তারপর সুরবালা নীরবালার কাণে কাণে কি বলিল—নীরবালা তাহাতে রাজি হইল না;—সে বলিল "মা বকিবে তুমি যাও ভাই।" সুরবালা আবার হন্ হন্ করিয়া নীরবালার মার নিকট যাইয়া আর্সি ও চিরুণী চাহিল। নীরবালার মা জিজ্ঞাসা করিল—"আরর্সি চিরুণী কি হইবে?"

সুর।—"শৈলজার মাথার চুল বাঁধিয়া দিতে হইবে। আজ শৈলজার বে"।

"নী-মা। কার সঙ্গে"?

সুর। "এই আমার ছেলে যে... সঙ্গে। "শৈলজা—নীরীর মেয়ে"...

নী-মা। "তা বেশ হয়েছে..."

ভবেন কার ছেলে হইল? সে কি আসে নি" ?

স্বরী। "সে আসিয়াছে—সে ও আমার ছেলে, সে নিৎবর হইবে"।

নী-মা। "বেতে পেলে কি" ?

স্বরী। "সে সব কথা এখন কিছু হয় নি; পাওনা থোওনার কথা কহিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছি"।

নী-মা। "ছেলের বেতে আমরা ত খেতে পাব" ?

স্বরী। "তা আর পাবে না ?—পাবে বৈকি"।

এই বলিয়া স্বরবালা একদৌড়ে আসি চিরুনি লইয়া নীরবালার নিকট উপস্থিত হইল ও চোখ্ মুখ ঘুরাইয়া বলিল—"হ্যালা নীরি! তুই আমাকে ফাঁকি দিতে বসে ছিস্। তোর মেয়ে—আমার ছেলে—আমি ছেলের মা, আমি যা' চাইব, তাই তোকে দিতে হবে ;—তাহা না হইলে আমার ছেলের সহিত তোর মেয়ের বিবাহ দিব না"। শৈলজার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল,—. শৈলজা মনে ভাবিল—তাহার বুঝি আর বিবাহ হইল না। যোগেশ ও ভবেনের মুখ শুকাইয়া গেল ; স্বরবালা তাহা দেখিল। শৈলজার কাঁদো কাঁদো মুখ খানি দেখিয়া নীরবালা, স্বরবালার উপর বড়ই চটিয়া গেল, ইহার উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিল না, স্বরবালাকে বলিল—"তুমি [illegible]ছেলের মা সত্য কিন্তু তোমার ছেলে [illegible]। করা নয় ; পাস্ করা হইলে যাহা [illegible]াহাই চাহিতে পারিতে।" স্বর-[illegible] ফাঁপরে পড়িল—একদিকে শৈল-[illegible] [illegible]ল্ ছল্ করিতেছে—অপর দিকে তাহার ছেলে পাস্ করা নয়। সে আর বেশী কিছু না কহিয়া এই মাত্র বলিল—"নীরি! তোর যা ইচ্ছা, তুই তাই দিস্।"

নীরবালা প্রথমে চন্দন ঘসিল। তার পর বর ও নিৎবরকে সাজাইতে আরম্ভ করিল। স্বরবালা শৈলজার মাথার চুল বাঁধিতে বসিল। প্রথমে চুলগুলি বেশ করিয়া আঁচড়াইতে লাগিল চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে গান ধরিল—

"সোনামুখী শৈলীবুড়ি লক্ষ্মী আমার মেয়ে।
নাহি নড়ে নাহি চড়ে চুলবাঁধ্‌তে গেলে॥
চুপ্‌টি করে বসে থাকে, যা' বলি তাই শুনে।
'রা' নাইকো মুখে তার, ঘাট নাইক গুণে॥"

স্বরবালার চুল আঁচড়ান থামিয়া গেল। গানও থামিল। তাহার কি মনে পড়িয়াছে —সে আবার বাড়ির ভিতর গেল ;—বাড়ীর ভিতর হইতে এবার গোচ্চার পরচুলা আনিল। নীরবালা জিজ্ঞাসা করিল "চুল গুলা লইয়া কি হইবে ?" স্বরবালা উত্তর করিল "কলি কাটিয়া চুল বাঁধিয়া দিতে হইবে ;" নীরবালা কেবল একটু হাসিল আর বড় কিছু বলিলনা। স্বরবালা আবার চুল আঁচড়াইতে আরম্ভ করিল ; এবার চুলের গুছি গুলি দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ; আবার গান ধরিল।—

"সোনামুখী শৈলীবুড়ি, লক্ষ্মী আমার মেয়ে।
নাহি নড়ে নাহি চড়ে, চুল বাঁধ্‌তে গেলে।
চুপ্‌টি করে বসে থাকে যা বলি তাই শুনে।
'রা' নাইকো মুখে তার ঘাট নাইকো গুণে।
এমন মেয়ে পাবি কোথায় দেখবি যদি আয়।
চুল্‌টি বাঁধা হ য়ে গেলে খেল্‌তে চলে যায়।"

শৈলজার চুলগুলি তাদৃশ বড় নয় ও চুলে চুলের গুছি খাইল না। স্বরবালা কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল "দূর পোড়ারমুখি, চুলগুলি একটু বড় করিতে পারিস্ নাই।" স্বরবালার আর কলি কাটিয়া চুল বাঁধা হইল না। শৈলজা স্বরবালার দিকে বিমর্ষভাবে একবার ফিরিয়া চাহিল। স্বরবালা তাহার মুখচুম্বন করিল। শৈলজার মুখ খানি আবার হাসি হাসি হইল।

এবার স্বরবালা ঝুঁটি বাঁধিয়া শৈলজার মাথার চুল বাঁধিয়া দিবে মনে করিল। আঁচলে সে কি বাঁধিয়া আনিয়া ছিল অঞ্চলের বন্ধনটি খুলিল, খুলিয়া "পট ডুরি" ও জগন্নাথের "দোনামালা" বাহির করিল। নীরবালা তাহা দেখিল ; কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল "ও আবার কি ?" স্বরবালা বলিল আহা! যেন কিছুই জানেন না,—তোর যে সেদি[illegible] বে হইল, এর মধ্যে সব ভুলে গেছিস্ ?"

নীর। "তা যেন হলো, ওনিয়েকি হবে"?

স্বর। "মাথার চুল বাঁধিয়া দিতে হইবে। আজ ত অঙ্গ দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দিতে নাই। তুই কি সব ভুলে গেছিস্ ?"

নীরবালা আর কিছু বলিল না ; কেবল স্বরবালা কি করে তাহাই দেখিতে লাগিল। নীরবালার বর ও নিৎবর সাজান হইয়া গিয়াছে। স্বরবালা ঝোঁটনে রাঙা স্থতা জড়াইতে লাগিল ও বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিতে লাগিল।

নীর। "বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বকিতেছ"?

স্বর। "পটডুরি জড়াইবার মন্ত্র।"

নীর। "কোথা হইতে শিখিলে ?"

স্বর! "ঠাকুরমার কাছ থেকে"।

নীর। "একটু চেঁচিয়ে বল না ভাই—আমিও শিখি"।

স্বর। "এখানে আর কেউ ত নাই ?" এই বলিয়া স্বরবালা একটু চেঁচিয়ে বলিতে লাগিল।

"রাঙা স্থতোয় সাদামনে বেঁধে দিনু চুল।
সোয়ামি পদে মনটা রেখো হয়না যেন ভুল॥
অমন রতন সোয়ামির মতন হয় যার মাথার মণি।
মানুষ ত ছার প্রাণী বল, কি করে তার শনি॥"

স্বরবালার রাঙা স্থতা জড়ান হইয়া যাইলে পর শৈলজার গালে একঠী চুমো খাইল। নীরবালা শৈলজাকে বলিল—"শৈলজা! স্বরীকে নমস্কার কর।" শৈলজা তাহাই করিল। স্বরবালা আবার শৈলজার মুখ চুম্বন করিল। শৈলজা আবার স্থির হইয়া বসিল। স্বরবালা এবার দোনা মালা কনের মাথায় জড়াইতে লাগিল। জড়াইতে জড়াইতে এবার জগন্নাথের স্তব ধরিল। নীরবালা এক মনে শুনিতে লাগিল—

"জয় জগন্নাথ পায়ে পড়ি, থাকে যেন শৈল বুড়ি॥
এয়ো হয়ে সোয়ামির কোলে বেঁচে যেন 'শ' কুড়ি।
ধনে পুতে লক্ষ্মী নিয়ে, করে যেন ঘর।
জয় জগন্নাথ পড়ি পায়ে, দেহ এই বর॥
শৈলী বুড়ী সাধের ছুড়ি (যেন) রেখো তারে পায়।
'সতী সাবিত্রী' বলে যেন পরম শত্রু তায়।
নামটি যেন থাকে তার সতী সীতের পাশ।

জয় জগন্নাথ পড়ি পায়, এই দাসীর আশ ॥"

নীরবালাও বলিল—

"নামটি যেন থাকে তার সতী সীতের পাশ।
জয় জগন্নাথ পড়ি পায় এই দাসীর আশ ॥"

সুরবালার স্তব শেষ হইল, চুল বাঁধাও শেষ হইল শেষ নীরবালাকে বলিল—"নীরি! তুই ততক্ষণ কনে সাজা, আমি গোটাকতক ফুল তুলিয়া লইয়া আসি—এখনো ঢের কাজ বাকি রহিয়াছে;—ফুলের মালা গাঁথিতে হইবে, গহনা গাঁথিতে হইবে, আরও কত কি করিতে হইবে। আর এত কষ্ট করিয়া তোতে আমাতে বর কনে সাজাইতেছি—কেহ দেখিবে না"? এই বলিয়া সুরবালা ফুল তুলিতে চলিয়া গেল। নীরবালা ততক্ষণ কনে সাজাইতে লাগিল।

সুরবালা একটু পরেই আঁচল ভরিয়া কাঠমল্লিকা ফুল লইয়া উপস্থিত হইল। বনে অজস্র মল্লিকা ফুটে—সুরবালা ও মনের সাধে আঁচল ভরিয়া তুলিয়া আনিয়াছে। একটি একটি ফুল লইয়া আপনি শৈলজার চুলে গুঁজিয়া দিতে লাগিল ও আহ্লাদে গান গাহিতে লাগিল—

"নীল আকাশে সাদা তারা ফুটলে
যেমন হয়।
শৈলীর কালো চুলে সাদা ফুল তেমনি শোভা-
ময় ॥
পেঁকো জলে কমল ফুটে আলো করে সর।
আমার—স্থলপদ্ম শৈলীবুড়ি আলো করে
ঘর ॥
চাঁপাফুলে চন্নন ছিটে দেখ্‌তে যেমন হয়।
শৈলীর কপালে কনে-চন্নন তেমনি শোভা-
ময় ॥

শেষ ফুলে মাথা ভরিয়া গেল। নীরবালা ফুলের হার ও গহনা গাঁথিতে ছিল তাহাও তাহার শেষ হইল—সে প্রথমেই শৈলজাকে ও তৎপরে নিৎবরকে সাজাইল। সুরবালার আহ্লাদের আর সীমা রহিল না; সে আহ্লাদে করতালি দিয়া নাচিতে ও গাহিতে লাগিল।—

"কলিযুগে রাম সীতে দেখ্‌তে যদি চাস্।
প্রাণ ভরে দেখে গিয়ে মেটা মনের আশ ॥
ধরাতলে অবাক্ ছিষ্টি অবাক্ হয়ে রবি।
পাপ তাপ সব দূরে গিয়ে চিরসুখী হবি।"

সুরবালা শুধু ফুল তুলিতে যায় নাই। ফুলতুলিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পাড়ার সকলকে বর কনে দেখিবার নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিল। পাড়ার সকলে সুরবালাকে 'সুরী পাগ্‌লী' বলিত, তাহারা সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত। প্রায় অনেকে আসিয়া তাহাকে গান পরিতুষ্টে দেখিয়াছিল। সুরবালার হুঁস্ ছিলনা; সে আপন মনে গাহিতেই ছিল; শেষ একজন প্রতিবাসী সুরবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ও সুরী পাগলি! তোর রাম সীতা ত দেখিলাম এখন লক্ষ্মণ কোথায়? একবার একাসনে তোর রাম সীতাকে বসা না?—দেখি।" সুরীপাগলী অমনি বাড়ীর ভিতর হইতে একখানি চৌকি আনিয়া দুই জনকে একাসনে বসাইল। যোগেশের দক্ষিণপার্শ্বে ভবেনকে বসাইল। সকলেই বর কনে ও নিৎবর সাজান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। সকলের মনে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের প্রকৃত ছবি—হৃদয়ে অঙ্কিত হইল; সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া একমনে

[illegible] লাগিল। ক্রমে সুরবালার ঠাকুরমা [illegible]। ঠাকুরমা আসিয়া চৌকির কাছে [illegible]য়া নমস্কার করিল। সকলি একস্বরে বলিয়া উঠিল "ওমা! ওকি গো! বুড়া মানুষ হইয়া—ব্রাহ্মণের মেয়ে হইয়া—বরকনেকে নমস্কার করিলে;"—"শৈলী, যোগেশ! তোমরাও ওঁকে প্রণাম কর।" যোগেশ ভবেন ও শৈলজা তাহাই করিল। বুড়ি বলিল "ওমা! আজ তোমরা রাজার অপেক্ষা বড়",—"দেব দেবী অপেক্ষা বড়"। রাজা আসিলে আজি ও সিংহাসন পাইবেন না, স্বর্গ হইতে দেব দেবী নামিয়া আসিলেও তাঁহাদের ও সিংহাসনের নিচে বসিতে হইবে। ব্রাহ্মণের ত কথাই নাই। ও আসনে আজ কাহারও অধিকার নাই ও আসন আজ সকলের পূজনীয়"। এই বলিয়া আবার নমস্কার করিল। শৈলজা, ভবেন, ও যোগেশ ও আবার প্রণাম করিল। একজন প্রতিবাসী অপর অপর প্রতিবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল "সুরী পাগলী, তার ঠাকুরমাও পাগলী"। সকলে হাসিয়া উঠিল। বুড়িও হাসিল—হাসিয়া তাহাকে "চির এয়ত্রী হইয়া বাঁচিয়া থাক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। সকলে অবাক হইয়া রহিল।

বেলা দশটা। বৈশাখ মাসের রৌদ্র। অল্পবেলাতেই অধিক বেলা হইয়াছে বোধ হয়। নীরবালার পিতা রৌদ্রের উত্তাপ দেখিয়া অধিক বেলা হইয়াছে ঠিক করিয়া কার্য্য হইতে (সমস্ত কার্য্য সমাধা না করিয়াও) বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। বাটী প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন বাড়িতে ভয়ানক মেয়ের ভিড়। সুরবালা বাড়ি ঢুকিবা মাত্রই তাঁহাকে তাঁহার নাতিনী শৈলজার সুরবালার ছেলের সহিত বিবাহ জানাইল। নীরবালা মাটির দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। অন্যান্য প্রতিবাসীরা নীরবালার পিতাকে দেখিয়া একটু লজ্জিত হইল। কেহ কেহ মাতার কাপড় একটু টানিয়া দিল; কেহ কেহ তাহাও করিল না। পল্লীগ্রামে সকলে প্রায় সকলের সহিত একটা মিছামিছি সম্পর্ক বাঁধাইয়া বাস করিয়া থাকে।

নীরবালার বর কনের দিকে নিমেষ দৃষ্টিকরিয়া হাসিতে হাসিতে একেবারে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন ও নীরবালার মাতাকে ডাকিলেন। গিন্নি আসিয়া উপস্থিত হইলে বলিলেন "অনেক বেলা হইয়াছে আজ ওঁদের সকলকে এখানে খাইতে নিমন্ত্রণ কর, কাহাকেও বাড়ী যাইতে দিও না। আমি মাছের জন্য বাহির হইলাম। এই বলিয়া গৃহ হইতে জাল বাহির করিয়া বাগানের দিকে যাইলেন। বাগান খিড়কিতে। অন্যদিক দিয়াও খিড়কিতে আসা যায়। বাগানে জাল রাখিয়া খিড়কি দিয়া মাছ ধরিবার একটা লোক ডাকিতে গেলেন। দুই একজন পুরুষ প্রতিবাসী আসিয়া এই শুভকার্য্যে নীরবালার পিতার সহিত যোগ দিল। আজ সে পল্লীতে মহাধুম পড়িয়া গেল। ক্রমে ক্রমে দুই একজন পুরুষ নিমন্ত্রণ হইতে হইতে গ্রামের পুরুষ আর কেহ বাকি রহিল না। সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন। নীরবালার মা বাহিরে আসিয়া প্রথমে বর কনে দেখিলেন। তারপর সকলকে সকলের হাতে ধরিয়া তাঁহার

বাড়িতে খাইবার কথা বলিলেন। নিজে তাঁহাদিগের বাটীতে গিয়াও বলিয়া আসিলেন। এ নিমন্ত্রণে কেহই আসিবার আপত্ত করিলনা। এ সুরীপাগলীর ছেলের বিবাহ—আর কাহারও ছেলের নহে। সুরবালার ঠাকুরমা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া স্বজাতির রঙ্গ ভঙ্গ দেখিতে ছিলেন। শেষ নীরবালার মাতার নিমন্ত্রণ শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন "এ বড় মন্দ নয়, ছেলেদের খেলা হইতে হইতে বুড়াদের খেলা আরম্ভ হইল, তা বেশ। সুরী,- তুই আয়—আমার বাড়িতে যা আছে যোগাড় যাগাড় করিয়া আনবি আয়—এত আমারও কাজ।" সুরবালা হন্ হন্ করিয়া বুড়ী ঠাকুরমার সহিত বাড়ী যাইল। নীরবালাও সুরবালার সহিত যাইল। পরক্ষণেই একটা চাকরের কাঁধে একভার আনাজ কোনাজ লইয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার প্রতিবাসিনীরা ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ গৃহ হইতে যে যাহা পারিল আনিয়া উপস্থিত করিল। কেহ শাক, কেহ আলু, কেহ বেগুন, কেহ মূলা, কেহ সুগন্ধি চাউল, কেহ বা দুগ্ধ প্রভৃতি যে যাহা পারিল আনিয়া উপস্থিত করিল। আনাজের আণ্ডিল হইয়া গেল। গোলা ভরা ধান চাউলেরও অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে কেহ বাটনা বাটিতে, কেহ আনাজ কুটিতে, কেহ সুপারি কাটিতে, কেহ পান সাজিতে, কেহ রন্ধনে নীরবালার মাতার সহিত যোগ দিতে আরম্ভ করিল। আমোদের সীমা রহিল না। পরক্ষণেই নীরবালার পিতা পুকুরে রুই মৎস্য, আম ও কাঁচা পেঁপে লইয়া আসিলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে বহু ব্যঞ্জন ও অন্ন প্রস্তু... যাইল।

প্রথমে পুরুষেরা আহার করিল। ...যের মধ্যে শৈলজার পিতা কেবল আসেন নাই। তাহাতে কেহই দুঃখিত হইলেন না। আসিলে সকলেই অতিশয় সুখী হইতেন সন্দেহ নাই। তৎপরে মেয়েরা আহার করিল। মেয়েদের মধ্যে প্রায় সকলেই আসিয়াছিল। কেবল শৈলজার মাতাঠাকুরাণী ও যোগেশের জ্যেষ্ঠ ভগিনী কাদম্বিনী আসেন নাই। শৈলজার মা আসি... বেন না সকলেই জানিত। কিন্তু যোগেশের ভগিনী কেন আসেন নাই কেহ কে... যোগেশের মাতা ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। যোগেশের মা উত্তর করি... "জামাই বাড়ি রহিয়াছে বলিয়া আসিতে পারিল না।" আর একজন বলিল "জামাই তোমার বার মাসই বাড়িতে থাকে ও থাকিবেন, তা বলিয়া কি সে কোথাও নিমন্ত্রণ যায় না?—না যাইবে না"? আর একজন বলিল "যে সময় টুকু সে এখানে আসিবে সে সময় টুকু তার গহনা পরিষ্কার করিলে ... খোল ব্যাসন দিয়া গা মাজিলে ক... দেখিবে"।

খেলা ঘরের বিবাহ হইয়া গেল... বিবাহের আমোদ আহ্লাদ ও একদিনে ফুরাইয়া গেল। পল্লীগ্রামে তখন এইরূপ (আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি) প্র... সামান্য বিষয়েই বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্ম কাণ্ড হইত, যথেষ্ট খাওয়া দাওয়া হইত, এইরূপ আমোদ আহ্লাদ করিত। এখন সে সব ফুরাই... গিয়াছে।

ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত।—

...সুন্দরী—১৲

...চিন্তা—১৲

...প্রেস ডিপসিটরী, ক্যানিং লাইব্রেরী, সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী, বি, বার্ণর্জির ...; মো, মো, মজুমদার কোং পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।—

কাব্যসুন্দরী সম্বন্ধে সম্বাদ-পত্রের অভিপ্রায়।

The language is simple and pleasant, and the author has displayed a happy nack of bringing his readers to a quick ...on of the beauties and qualifications of the characters taken ...criticism.—Indian Mirror Sept. 20, 1880.

"...লা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ এই প্রথম হইল। আলোচ্য গ্রন্থে পূর্ণবাবু বঙ্কিম বাবুর ...র্য দেখাইয়াছেন।—সাধারণী ৭ই ভাদ্র, ১২৮৭।"

"...সাহিত্যানুরাগী পাঠকগণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিবার জন্য আমরা বিশেষ অনু...রি। পূর্ণবাবু নিজে ভাবুক ও হৃদয়ালু। পাঠকের মনে সেই ভাবুকতা ও হৃদয়া...ন করিয়া দিতেও বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন ...র্ণবাবু বঙ্কিম বাবুর সহিত একাসনে বসিতে অধিকারী হইয়াছেন। কাব্যসুন্দরী ...সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি। যাঁহারা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস-গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, পূর্ণ...ব্যসুন্দরী না পড়িলে, তাঁহাদের অধ্যয়ন-বিষয়ে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইবে। ...ভাকর ৭ই ভাদ্র, ১২৮৭।"

সমাজ-চিন্তা সম্বন্ধে সম্বাদ পত্রের অভিপ্রায়।

...বাবুর সমাজ-চিন্তা চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। কিসে হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা ... উপায়ে তাহার মোচন হইতে পারে, এই গ্রন্থে পূর্ণবাবু তাহার বিচার করিয়াছেন ...তিনি যে স্বদেশানুরাগে উত্তেজিত হইয়া দেশের দুরবস্থার প্রকৃত কারণ ও বিদেশীয় ... দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহার মোচনের উপায়-নির্ণয়ে চেষ্টা করিয়াছেন, অসার ...র মধ্যে একখানি সারল গ্রন্থ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ...করি।"—বঙ্গবাসী ১৮ই আষাঢ়, ১২৮৯।

...যুক্ত পণ্ডিত হরিমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রকাশিত সুপ্রশংসিত "গীত-গোবিন্দ" ...দের নিকট পাওয়া যায়। "গীত-গোবিন্দ"—মূল্য ১৲এক টাকা, বাঙ্গালা অনুবাদ ...ক মাশুল সতন্ত্র দিতে হইবে।

বিভা-প্রকাশক।

Tight Binding